কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র

কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার

সংকলন

সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥

১, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

সূচী

ভূমিকা —

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের পরিচয় আমাদের কাছে কত অল্প। একটা সমগ্র জাতির সাহিত্যকে যিনি জাতে তুললেন, জাতীয় জীবনের বিশেষ একটি চিন্তাধারার যিনি উৎস, সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে যিনি কর্মযোগী তাঁর কি পরিচয়ই বা আমাদের জানা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় সত্তর বছর চলে গেছে; আজও বাংলা ভাষায় তাঁর একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই। আরো আশ্চর্য, আমরা যারা বাংলা ভাষার পাঠক আমাদের দিক থেকেও কোন দাবী ওঠেনি, আমরাও কোন ঔৎসুক্য দেখাই নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য কি তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ নয়?

আমরা তাঁকে ঋষি বলে জেনেছি, বন্দেমাতরম-এর স্রষ্টা বলে তাঁর মহিমা প্রচার করেছি, তাঁর সমসাময়িক সমালোচকেরা তাঁর কথা ভুলে আয়েষা তিলোত্তমা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সৃষ্টির চমকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

তাঁর সম্পর্কে যে দু'একটি জীবনী মুদ্রিত হয়েছিল তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। উপকরণের স্বল্পতা যে তার প্রধান কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিকটাত্মীয় শচীশচন্দ্রের রচনাও প্রধানতঃ কাহিনী ভিত্তিক। তারও অনেকটাই উপন্যাস আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। তীব্রক্ষমতা সম্পন্ন একটি মানুষের বহিরঙ্গ কাঠামোর ক্ষীণ আভাস ছাড়া তাতে আর কিছু নেই। এ জাতীয় জীবনীর উপরে ভরসা করা কঠিন। এতে না পাওয়া যায় ঘটনাগত নির্ভরতা না আছে মানুষটির উত্তপ্ত হৃদয়ের কোন স্পর্শ। তবু সবটা হারিয়ে যাওয়ার আগে আত্মীয় পরিজনদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে লেখক যতটা ধরে রেখেছেন সেটুকুর জন্যেও আমরা কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া অন্যান্য যে জীবনীগুলি আছে তার মধ্যে অক্ষয় দত্তগুপ্তের জীবনীটি মোটামুটি একটা ধারণা দেয় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে।

আধুনিক কালের সাহিত্য স্রষ্টাদের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ তাঁদের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভার টানে যত মানুষ এসেছিলেন কাছে তাঁদের অনেকেই কিছু না কিছু লিখেছেন। সেই লেখাগুলির

মধ্য দিয়ে সুখ দুঃখে মেশানো, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁকে ঘিরে যে পরিমাণ অন্তরঙ্গ স্মরণ-কথা রচিত হয়েছে তা বোধহয় ভারতবর্ষে আর কাউকে নিয়েই হয়নি। এর একটা সুবিধা আছে এই যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিলেও অনেক গান, গল্প, কবিতার জন্মলগ্নটিকে পাওয়া যায় ঐ রচনাগুলির মধ্যে। তাতে তার অর্থগ্রহণ সহজ হয়; সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, ব্যথা বেদনায় আন্দোলিত মানুষটির সঙ্গে, সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার অতীত কবিপ্রতিভার যোগ অনুভব করা সহজ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই ধরণের রচনার বড় অভাব। তৎকালীন পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে বহু লেখা আছে, তার অধিকাংশই উচ্ছ্বসিত বাগ্‌বিন্যাস, সাহিত্যালোচনার অক্ষম প্রচেষ্টা, মানুষটিকে উদ্ঘাটন করবার কোন প্রচেষ্টাই নেই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দীনবন্ধুর জীবনী রচনা করতে বসে বলছেন যে, মানুষ দীনবন্ধুর হৃদয় উদ্ঘাটন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ সামনে পেয়েও তাঁর সাহচর্যধন্য ব্যক্তিরা তাঁর কথা কিছুই লিখে যাননি। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবহিত করতে চাই যে ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন বোধহয় পুরুষদের পক্ষে যতটা স্বাভাবিক নারীদের পক্ষে তার চেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের যে স্মৃতিচিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদে পরিণত হয়েছে তার প্রায় সব কটিই মেয়েদের লেখা। এবং সেগুলিতে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার একটি রস আছে যা অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন পুরুষের লেখায় নেই। অবশ্য সেই সঙ্গে একথা মনে রাখতেই হবে যে বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিনই বাইরের লোকেদের কাছে নিজেকে এমনভাবে খুলে ধরেন নি যাতে তাঁর একটা অন্তরঙ্গতার রসেভরা ঘনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়। সমাজে অত্যন্ত রাসভারী, গম্ভীর, প্রতাপশালী ব্যক্তি হিসাবে তাঁর পরিচয় ছিল; অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন—এ অভিযোগ তো অক্ষয় সরকার তাঁর সামনেই করেছেন। রামকৃষ্ণদেব তো বেশ চটেই ছিলেন বঙ্কিমের অত্যধিক শিক্ষার অভিমান দেখে। পরিশেষে যখন ধর্মচর্চায় নামলেন, যখন কৃষ্ণচরিত্র লিখতে বসলেন তখন তো জাতির গুরুর আসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে তাঁর সহকর্মী ও সমবয়সীদের মান মর্যাদার পার্থক্য ছিল প্রচুর, চিন্তা ভাবনার দূরত্ব ছিল গভীর। যাঁরা বঙ্কিমের কথা লিখেছেন তাঁরা সকলেই সেই দূরত্ব বজায় রেখেই লিখেছেন—ঘনিষ্ঠ হবার যেটুকু চেষ্টা তা তাঁর সপ্রশংস সানুগ্রহ দৃষ্টিপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে তাঁর কিছু মুখের কথা ধরে রাখার চেষ্টাই এখানে মুখ্য চেষ্টা।

সাহিত্যের আসরে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দেখেছি তাতে তাঁর বুদ্ধি, মনীষা, প্রগাঢ় বিচারশক্তি ও সূক্ষ্ম রসবোধের অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এক নিমেষের মধ্যেই বুঝতে পারি যে তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে তাঁর মন কত সজীব কত সচল। কিন্তু এই স্মরণ কাহিনীগুলিতে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী যেমন সযত্নসঞ্চিত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুহূর্তগুলি তেমনি অবহেলিত। কখনো কখনো প্রসঙ্গক্রমে সে কথা উঠেছে কিন্তু সে প্রসঙ্গ বেশিদূর চলার আগেই লেখকেরা থেমে গেছেন। হয়তে মনে হয়েছে জাতির নেতা বঙ্কিম হাস্যালাপ করছেন এ ব্যাপারটাকে বেশী প্রশ্রয় দিলে তাঁর মহিমার গুরুত্ব রক্ষিত হবে না। অল্প কয়েকটি কথায় রসিক বঙ্কিমের একটি উজ্জ্বল ছবি রবীন্দ্রনাথই ধরে রেখেছেন।

তবু এই লেখাগুলির মূল্য অসামান্য—কারণ তাঁর মন কি ভাবে চিন্তা করছে তার নানা ইঙ্গিত এইগুলির মধ্যে লুকোনো রয়েছে। সাহিত্য সমাজ, ধর্ম বিষয়ে তাঁর নানা চিন্তা, তাঁর ব্যবহারের আভিজাত্য চাকরীজীবনে তাঁর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, বঙ্গদর্শন প্রচারের নানা সমস্যা এর মধ্যে আছে। সেগুলি তাঁর ঘরোয়া জীবনের কথা নয়। সেগুলির যোগ আছে তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে, তখনকার সমাজচিন্তার সঙ্গে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই রচনাগুলি থেকে উদ্ধার করা গেছে তিনি এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম শুধু তাঁর সৃষ্টির জন্যেই নন তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যেও বটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গভীর অধ্যয়নে তিনি পাশ্চাত্যভাবনার বহু মূল ধারণাকে অঙ্গীকার করেছিলেন। যে বিষয়ে তাঁর মন সবচেয়ে আকৃষ্ট হলো তা হলো জাতীয়তার ধারণা। তিনিই যে স্বাদেশিকতার মন্ত্রদ্রষ্টা এ বিষয়ে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। এই স্বাদেশিকতার কোন উগ্র প্রকাশ রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা দেখিনি। বঙ্কিমচন্দ্রই এই শিক্ষাকে বাংলার সমাজ জীবনে একটা বিশেষ শক্তিশালী জীবনদর্শনে রূপায়িত করলেন। তার প্রত্যক্ষ ফল হলো এই যে জাতীয়তার অভিমান সহজেই প্রবল হয়ে বাহুবলে, ধর্মবলে, সংস্কারে, সভ্যতায় আমরা যে সকলের চেয়ে বড় এই বিশ্বাস তাঁর মনে সুদৃঢ় করে দিল। তাঁর প্রচণ্ড শক্তি এই তত্ত্বকে প্রমাণ করবার কাজে লাগলো। সংস্কারবাদীদের বিরোধী হলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মেটিরিয়াল প্রস্পারিটির অধিষ্ঠানভূমি বলে ব্যঙ্গ করলেন, অবতার তত্ত্বে পুনর্বিশ্বাস জাগাতে চাইলেন। শ্রীশ মজুমদারের লেখায় দেখি তিনি ভৌতিক ঝাড়া ঝোড়া, mesmerism তারকেশ্বরের মানত প্রভৃতিতেও

বিশ্বাস করছেন। আবার যখন সমাজতন্ত্রের নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তির লীলা দেখি তখন বিস্মিত হয়ে ভাবি—একই মানুষের একি দুই রূপ। হিন্দুত্বের অভিমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি নিজের মত করে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, তাতে বহু বস্তুকে অহিন্দু বলে বাতিল করলেন। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টই বলছেন—"**It will exclude as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by the Hindus themselves.**" বলা বাহুল্য এইভাবে ইচ্ছামত হিন্দুধর্মকে মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা কতদূর সঙ্গত তা প্রশ্নাতীত নয়। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের বিচারপদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে একদিকে এই বিশ্বাসপ্রবণতা যা তারকেশ্বরের মানত পর্যন্ত মেনে নেয় অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্য ও ধনবণ্টনের অবিচার সম্পর্কে তাঁর তীব্র কঠিন যুক্তি আমাদের বিস্মিত করে।

এই গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বলিষ্ঠ আভিজাত্য লক্ষ করা যাবে। সে আভিজাত্য বাইরের ঠাটে যেমন তেমনি চরিত্রে ও মনে। নিজের রচনা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তবু যেদিন শুনলেন বন্দেমাতরম গানের বিরূপ সমালোচনা সেদিন স্পষ্টই বল্লেন যে লোকের ভাল মন্দ লাগার চেয়ে তাঁর নিজের ভাল লাগাটাই এ বিষয়ে অনেক বড়। জনমুখাপেক্ষী সাহিত্য, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ-লেখকের ফসল। যিনি যথার্থ শিল্পী তিনি জানেন যে মহৎ সাহিত্য কালজয়ী তা ক্ষণকালের মুখর করতালির প্রত্যাশী নয়। এখানে তাঁর আভিজাত্য সাধারণের দাবীর কাছে মাথা নত করে নি। আবার এই বঙ্কিমচন্দ্রই নিজের লেখার বিরূপ সমালোচনায় কাতর হতেন। মুখে বলতেন বিরূপ সমালোচনা ন্যায্য হতে পারে কিন্তু মনে মনে আঘাত পেতেন। এদিক থেকে তিনি সেই স্রষ্টাদের সমগোত্রীয় যাঁরা সমালোচনার আঘাতকে বাইরে জয় করে মনে মনে বেদনার্ত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বলছেন, "মতবিরোধী সমালোচনা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিলনা, এ বিষয়ে তাঁহার কাছে অতি বড় পাণ্ডিত্য অথবা বন্ধু বাৎসল্যের কোন মূল্য ছিল না।" অথচ এই বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন তখনকার বাংলায় শ্রেষ্ঠ সমালোচব—তাঁর ক্ষুরধার লেখনী বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ আবর্জনা মুক্ত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রাসভারী লোক ছিলেন—তাঁর কাছে যখন তখন আসাযাওয়া খুব সহজ ছিল না। বলা বাহুল্য সংযত বাক্যের ব্যবহারে, বাহ্যিক উচ্ছ্বাসের অভাবেই এ রকম মনে হয়েছে। তাছাড়া শেষ জীবনের বেশ কয়েকবছর তিনি ছিলেন বাংলার সমাজপতিদের অন্যতম। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও মনীষাকে সাধারণে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখতো। ফলে খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ বোধ হয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর পরিণত বয়সেও নাচে গানে সান্ধ্যআসরে, শিক্ষকতার ভূমিকায়, সাধারণ মানুষ ও পল্লীবাসীর অতি নিকটে এসেছিলেন বঙ্কিমের সে সুযোগ হয়নি। ফলে সমাজের শিক্ষিত পণ্ডিতমহলের যে যে অল্প কয়েকজন নিজের গরজে তাঁর কাছে আসার পথ করে নিয়েছিলেন তাঁরাও বুদ্ধির চকমকি পাথরে জ্বলে ওঠা বঙ্কিমকেই পেয়েছেন—ভিতরের মনের মানুষ ধরা পড়েনি। যে রচনাগুলি এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অংশমাত্র। যেটুকু ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সেইটুকুই এখানে উদ্ধৃত হলো। সুরেশ সমাজপতির বিস্তৃত রচনাটি থেকেও কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজপতির রচনায় বাঁধুনির অভাব থাকার ফলে অনেক অসংলগ্ন কথা বঙ্কিম প্রশস্তির মধ্যে রয়ে গেছে। সমাজপতি বঙ্কিমের সঙ্গে বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে বঙ্কিমের বিশেষ কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ধরা পড়েনি। ফলে এমন অনেক জিনিসকে সমাজপতি সুদীর্ঘ স্থান দিয়েছেন যার কোন প্রয়োজনই বঙ্কিমজীবনে নেই।

এই সংকলনের যেটি শ্রেষ্ঠতম রচনা সেটি হলো শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ। এই একটি মাত্র রচনায় মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ঘনিষ্ঠ নিকট সাহচর্য পাঠকেরা পেতে পারেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে নিজেকে আরোপ করেন নি, এবং নিজের ভালমন্দের রঙে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-সত্তার নিজস্ব রঙটি ধুয়ে দেননি। সাহিত্য আলোচনাও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের যেটুকু হয়েছে তা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই রক্ষা করেছেন। শ্রীশচন্দ্রের কাছে রাসভারী বঙ্কিম অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর প্রভাব না থাকলে তাঁর জীবন হয়তো অন্যরকম হতো। বাল্যকালে কুসংসর্গ, চাকরীর অভিশাপ, কল্যাণ স্ত্রীর স্বরূপা এ সব কথা তিনি শ্রীশচন্দ্রের কাছে বলেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নতুন সাহিত্যিকদের তিনি সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। নিজের রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি

লোকেরও মতামতের স্থিরতা ছিল না। শ্রীশচন্দ্রের কাছে কৃষ্ণকান্তের উইলকেই তিনি একবার তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছিলেন (পৃঃ ১৪) অল্প কিছু কাল পরেই বলেছিলেন রাজসিংহ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস (পৃঃ ২৩) অবশ্য সময়বিশেষে নিজেরই ভিন্ন ভিন্ন রচনার স্বাদ নিজের কাছেই পৃথক হতে পারে।

বিজয়লাল দত্তের রচনাটিতে তখনকার কংগ্রেস ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লিপি-বদ্ধ আছে। উচ্চপদস্থ সরকারী কাজ, ব্যক্তিগতজীবনে অভিজাত চাল চলন এবং সামাজিক পরিবেশজনিত দূরত্ব সত্ত্বেও চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন, "দেশের সাধারণ জনসমষ্টিকে মন্ত্রণা-গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া বৎসরান্তে একবার ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে প্রমত্ত হইলে তাহাতে দেশ জাগিবে না।" পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছিলেন বার বার। কংগ্রেসের প্রতি যে বঙ্কিম চন্দ্রের সহানুভূতি ছিল তিনি তাও বলেছেন। কিন্তু সহানুভূতির থেকে যে সমালোচনার জন্য তা কোন বিশেষ পক্ষপাতের দ্বারা দুর্বল হয়ে না পড়ে সে দিকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা সজাগ ছিলেন।

কালীনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সরকারী চাকুরী করেছেন, তাঁর লেখাটিও মূল্যবান নানাদিক থেকে। আইভান হো—দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত বলেছেন যে নিজের বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি বঙ্কিমবাবুর কথায় স্বীকার করেছিলেন যে দুর্গেশনন্দিনী আইভানহোর দ্বারা প্রভাবিত নয়। কালীনাথ দত্ত জোর করে বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের **Honesty**কে তিনি **unimpeachable** বলে বিশ্বাস করেন। কালীনাথের রচনার আর একটি প্রসঙ্গ মূল্যবান। লেখক প্রসঙ্গটি বিস্তৃত না করেই, শুধু উল্লেখ করে নীরব হয়েছেন সেটি হলো এই, "বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিভাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।" বাক্যটি থেকে সঠিক কোন ধারণা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে পরবর্তী জীবনের কৃষ্ণচরিত্র প্রণেতা বঙ্কিমের আবির্ভাব তখনো হয়নি। তিনি হয়তো তখনো যুক্তির বিচারে সত্যের যাচাই করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই ধরণের কথা কেবলমাত্র কালীনাথের লেখাতেই পাই। কালীনাথবাবুকেও অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তাঁর রচনায় আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় আছে, কোনো অসতর্ক শিথিল উক্তি তিনি করেন নি। শ্রীশচন্দ্রের মতই কালীনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তিবিহ্বল অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে লিখতে বসেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "বঙ্কিমবাবু বাংলার বর্তমান সাহিত্যের—বিশেষতঃ ধর্ম সাহিত্যের—কোন ধারই ধারিতেন

না, এবং কোন সংবাদই লইতেন না।" (পৃঃ ৫৭)। কালীনাথ দত্তের লেখাতেই জানি যে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচারিত 'Quotations from the writings of Ram Mohan Ray' পুস্তিকা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহন রায়ের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন "রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল।" (পৃঃ ৫৮) এর থেকে অনুমান করতে হয় যে রামমোহন রায়ের মূল লেখা বঙ্কিমচন্দ্র তখনও পড়েননি। তিনি যে মূর্তিবিশ্বাসী সনাতন হিন্দু ধর্মের নেতা হয়ে পড়েছিলেন বোধহয় অনেকটা তারই অভিমানে রাজা রামমোহন রায়ের বিপুল সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বকে বুঝতে চাননি। ঠিক ঐ একই কারণে তাঁর সমকালের ব্রাহ্মকর্মীদের স্বার্থত্যাগ ও সমাজ-সেবার প্রচেষ্টাকেও তিনি প্রশংসা করতে পারেন নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র' এবং পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' ঘটনার ভারে সমৃদ্ধ। গল্পের রস আছে কিন্তু ব্যক্তি বঙ্কিমের মন ও হৃদয় এই লেখাগুলির মধ্যে বিশেষ আত্মপ্রকাশ করেনি। চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিম'ও ঐ জাতীয়ই।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী 'সঞ্জীবনী সুধা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে তাঁদের পারিবারিক কথা প্রচুর আছে। সেইজন্য সেই লেখাটি এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যে কৈফিয়ৎটি দেন সেটিও মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে সাহায্য করবে এই মনে করে পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি চিঠিও পরিশিষ্টে সংযোজিত হল। চিঠিগুলি শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ বঙ্কিমগ্রন্থাবলীতে ইতিপুর্বেই মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি বঙ্কিমপ্রসঙ্গ সংকলন করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন। সে গ্রন্থ বহুদিন পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এই সংকলনের কয়েকটি রচনা বঙ্কিমপ্রসঙ্গে ছিল আর কয়েকটি ছিল না। জাতিকে যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের ভুলে যাবার একটা আশ্চর্য প্রবণতা আমাদের আছে। সেই অপরাধের বোঝা বেশি ভারী হবার আগে এই ক্ষুদ্র সংকলনকে কেন্দ্র করে মনের ভার হাল্কা করি। মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ভালবেসেছিলেন ; আমরা তাঁর অকৃতজ্ঞ উত্তরপুরুষ, তাঁর কীর্তি নিয়ে উল্লসিত, সেই কীর্তির স্রষ্টাকে নিঃশেষে ভুলতে দিয়েছি নিজেদের।

বহু কীর্তির পরেও রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে বার বার বলেছেন আমি তোমাদেরি লোক। সারাজীবন ধরে বলেছেন মানুষের স্মৃতির মধ্যে শুধু, কীর্তি নয় নিজেও যেন থাকি—মনে পড়ে সেই গান—তবু মনে রেখো, বা এই কথাটি মনে রেখো। বঙ্কিমের মনেও এই অতি সরল মানবিক কামনা কি ছিল না—তিনি কি মনে মনে একথা বলতে চাননি 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

তাই তত্ত্ব নয়, তথ্য নয়, উপন্যাস প্রবন্ধ নয় স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষায় জড়ানো মানুষটিকে পাঠকেরা যাতে খুঁজে পেতে পারেন তারই চেষ্টায় এই সংকলন।

এই সংকলন করার কাজে যাঁর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ তিনি হলেন শ্রীজানকী নাথ বসু। তিনি শুধু প্রকাশকই নন সাহিত্যরসিকও বটে। এই সংকলনের কাজে তাঁর কিছু কিছু নির্দেশ আমায় সাহায্য করেছে। শ্রীমতী মুক্তি রায় পুরানো পত্রিকা থেকে অনেকগুলি লেখা উদ্ধার করে দিয়েছেন। তিনি এই সংকলনের কাজে আমার সহযোগী—ধন্যবাদ প্রত্যাশী নন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

২২শে আগষ্ট ১৯৬০

কাছের

মানুষ

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ একা সে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি;
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে ক্ষীণ কম্প্রকণা
অঙ্কুর ওঠেনা যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎসে উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিয়াছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গনি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ॥

১৮৭৯।৮০ সালের বর্ষাকালে চুঁচুঁড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথযাত্রা এবং আমার সহযাত্রী অতুলবাবুতে আর আমাতে ট্রেন ফেইল করিয়া অনেকক্ষণ হাবড়ার ষ্টেসনে বসিয়াছিলাম।

মিষ্টার অতুলকৃষ্ণ রায় তারপর য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন—নানাদেশ দর্শন এবং বিস্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহচর্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি সেদিনকার বর্ষাধৌত প্রভাতটিকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সৌভাগ্যগর্বের একটা আনন্দ হিল্লোল আমার শরীর মন অভিষিক্ত করিতেছিল।

চুঁচুঁড়ার যোড়াঘাটে আমাদের গাড়ী যখন পৌঁছিল, বঙ্কিমবাবু তখন অফিসের পোষাক আঁটিয়া বাহির হইয়াছেন—এগারোটা বাজিতে বেশী দেরী নাই। বলিলেন চিঠি পাইয়া প্রাতঃকালে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাহোক অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে কথাবার্তা হইবে। সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সৌম্যমূর্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, আর কখন সেরূপ দেখিয়াছি মনে হয় না।

প্রায় তিনটার সময় আবার দেখা হইল। ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলার সাজসজ্জা এবং কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ নল দেখিয়া আমার "বিষবৃক্ষে"র হুঁকার স্তব মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্তা যাহা হইয়াছিল তাহার সারাংশ মাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন "এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখিনা—ইংরেজী ভাষাটা ভারি insincere বলিয়া মনে হয়।" আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, "মাসিক সমালোচকে" আপনার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশী করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই। প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্টিসৌন্দর্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে। কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু

বলিলেন, এখনকার ছেলেরা দেখিতে পাই গুরুজনদিগকে আগেকার মত প্রণাম করে না। নিজের বাড়ীর রথ দেখিবার জন্য তাঁহার অপরাহ্ণে কাঁঠালপাড়ায় যাওয়ার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিমবাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম, নব্যযুবকদের প্রতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। জামাতা রাখালবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীশবাবুকে আর বেহাইকে জল খাওয়াও।" এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পৌঁছিলেন—বঙ্কিমবাবুর কাঁঠালপাড়া যাওয়া হইল না।

ইহার পর মনে হইতেছে কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বহুবাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু কথায় কথায় বলিলেন, "কই চন্দ্র তুমি বাঙ্গলা লেখা ছাড়িলে, বাঙ্গলা যে আর পড়িতে ইচ্ছা করে না।" "রাজসিংহ" তাহার কিছুদিন আগে বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁর কোন বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, "এঁরা বলেন আমার সৃষ্ট চরিত্র-গুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।" বলিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।" চন্দ্রশেখরবাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মাণিকলালের মত ২।১টা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। আর একদিন চন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখরবাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওঁকে চেন না?—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম!" মনে হইতেছে এই দিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর হইতে বঙ্কিবাবুর একটি প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে মিলনের আনন্দ এবং হাস্য এখনও আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পড়?" উ—**Fourth year, Presidency College.** বঙ্কিমবাবু—রাখালের সঙ্গে আলাপ নেই? উ—না। বঙ্কিমবাবু—সে কি হে—এক ক্লাসে পড়, আলাপ

নেই? সঞ্জীববাবু বলিলেন "তা জাননা বুঝি? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটি ঘোর বেয়াদবি। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্য শিক্ষিতের সঙ্গে একজন সেকেলে লোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে তাঁর নামটি কি? নব্য বাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি আবার প্রশ্ন "মশায়ের পিতার নাম?" বাবুটি চটে লাল, বুড়োকে মারেন আর কি! ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া বাড়ীর অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্য বাবুটিকে সুধাইল, "বাবু বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগ কেন? ভারি হাসি পড়িয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথবাবু, নবীনবাবু প্রভৃতি। নবীনবাবু কথায় কথায় "আনন্দমঠের" সুপরিচিত "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিসটিকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা ভাই ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে তাই ওরকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব!"

কিছুদিন আমি রীতিমত ডায়েরী রাখিতাম। ১৮৮২ সালের জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কাল মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখাশুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরুশিষ্যের যে সম্বন্ধ, একদিকে গাঢ়স্নেহ এবং প্রীতি, অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। অতএব বিস্তর কথা আদৌ স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বলিতে পারিব।

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী "আর্যদর্শন" পত্রে "শৈবলিনী" চরিত্র সমালোচনা করেন। সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র চলিয়াছিল। লোকনাথবাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে "দুর্গেশনন্দিনী"র অভিনব সংস্করণে দিগগজকে নূতন রূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিমবাবু উত্তর দেন যে একশ্রেণীর অনুকরণ প্রিয় লেখক বিদ্যাদিগগজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সে চরিত্রের কোন কোন

স্থল নূতন করিতে হইয়াছে। প্রতাপ যেখানে বলিতেছেন যে "তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম" সেই স্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথবাবু বলিয়াছিলেন যে প্রতাপের অসাধারণ বলবান চরিত্রে সে রূপ ভাব কেন? বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছিলেন যে প্রতাপ বস্তুতঃ অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাহার মহত্ত্ব এবং তাহাই প্রকৃতিসঙ্গত।

সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একদিন আমার গ্রীক লাওকোয়নের কথা হইতেছিল। তিনি বুঝাইতেছিলেন, গ্রীক শিল্পী সেই প্রস্তর মূর্তিতে কি সুন্দর কাব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলদৃপ্ত লাওকোয়ন সর্পবেষ্টিত এবং আসন্ন মৃত্যু হইয়াও বামে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র দুটিকে যত্নে রক্ষা করিতেছেন, সেই অবস্থায় দৃঢ় ওষ্ঠে অধর চাপিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বিধাতা দেবতাদের জানাইতেছেন, অদৃষ্ট লিপি অখণ্ডনীয় জানিয়াও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সঞ্জীববাবু বলিলেন, এইখানে শারীরিক বলে ধর্মবল মিশিয়াছে এবং মাঝে একদিন বঙ্কিমবাবু কুমারসম্ভব হইতে হিমালয় বর্ণনা পড়িতে পড়িতে প্রতিশ্লোকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন কোন কবিতাতেই কেবল প্রকৃতি বর্ণিত হয় নাই—সর্বত্র অন্তঃসৌন্দর্য নিহিত আছে। শুনিলাম সেদিন প্রায় রাত্রি বারটা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে কাব্যালোচনা করিয়াছিলেন। আমার সমক্ষে সেই রাত্রির কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবুর এক বন্ধু বলিলেন, "তোমার সে দিনকার কথামত বোধ হয়—কিছু লিখিবে, কিন্তু তাহার ভাষা তত ভাল নহে।" আমি বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম, "আপনিই কেন লিখুন না?" বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন "আমি বুড়া হলাম, আর পারিনে, এখন তোমরা লেখ।"

১৮৮৩-৮৪ সালের বসন্তকালে কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়া আমি কলিকাতায় আসি। আমার গৃহিণী এক অদ্ভুত রকমের হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন উহা clairvoyance. এই রোগ ডাক্তার সরকার অতি আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করেন। আমার ডায়েরীগুলি যদি কখন ছাপা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হইবে। এখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে বঙ্কিমবাবু তদুপলক্ষে নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

২১শে ফাল্গুন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। আমার সহধর্মিণীর অসুখের কথা এবং তাঁহাতে কতকগুলি শক্তি বিকসিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, "রোগ মারাত্মক নয়। একটা কথা যেন মনে রাখা হয়।

রোগিনীকে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে, হিষ্টিরিয়া দৌর্বল্যেই হয়।" কথায় কথায় আমি তাঁর নবেলসমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথাই তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন, "সব নবেলেই আছে বটে কিন্তু কেন থাকে জানিনা।" আমি বলিলাম, "আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে শৈশবাবধি তার দরুণ মনে একটি impression আছে।" বঙ্কিমবাবু—"সে গল্প শুনিয়াছি বটে কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।" আমি বলিলাম, "বইয়ের অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ কখন দেখিয়াছেন কি না?" একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন "না।" তারপর সিনেট সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু Theosophy এদেশে আসিবার পূর্বে আমি তা লিখেছি।" পৌষসংখ্যা বঙ্গদর্শনে "দেবী চৌধুরাণী" কার লেখা জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, উহার "Mysterious anthor-ship." আমি বলিলাম, তাঁর লেখা বলিয়াই আমার বোধ হয়েছে। উত্তর, "অনেকে তা বলেন না।" একদিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ী গিয়া দেখি তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু এবং সঞ্জীববাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইঁহাদের ভারী একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয় Universityতে মেয়েদের বি, এ, উপাধি লাভ উপলক্ষে হেমবাবুর অভিনন্দন কবিতাটি। হেমবাবু ইংরেজীতে বলিতেছিলেন, "তোমাদের কোন উৎসাহ নাই, জীবন নাই।" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "ইহাতে বুঝা যাইতেছে তুমি সকলের ছোট।" তখন হেমবাবু সঞ্জীববাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, দুজনে একটু রহস্য চলিল। পরে হেমবাবু বঙ্কিমবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "Sentiment governs the world, not logic." বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তা ত বটেই।" পরে অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

২৬শে চৈত্র সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎকালে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রবীন্দ্র কাল এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার পরিবারের সম্বাদ পাই। নূতন বাসায় বাতাসের সুবিধা কেমন? আমি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিব। ছাদে রোগিনীকে শয়ন করানোর ব্যবস্থা করা যায় না কি? আমার মধ্যমা কন্যাটি সেবার হিষ্টিরিয়াতে দুইমাস কষ্ট পায়। যে ঘরে তাকে রাখা হয়, দিনরাত্রি তা খোলা থাকত, এত বাতাস যে সহজ লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব। মাঠের ভিতর ঘর। যা তা

খাওয়াইতাম, দুমাসেই সারিয়া গেল।" সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, অলকট সাহেব আসিয়া কি করিল? আমি তাঁহার ও মিসেস গর্ডনের কার্য বর্ণনা করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় mesmerize করিতে জানেন। সে দিন তিনি (বঙ্কিমবাবু) ডাক্তারি কোন পুস্তকে পড়িতেছিলেন, ফোড়ার উপর mesmerize করার মত অঙ্গুলী চালনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয়, তবে আঙ্গুলে কর্পূর মাখাইতে হয়। সঞ্জীববাবু বলিলেন, তাঁহার নিজেরও কিছু কিছু mesmeric power আছে, তিনি উহার দ্বারা নিজের স্ত্রীর ফোড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ফোড়া স্পর্শ করিতে হয় নাই। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "শ্রীশবাবু সকলই তো দেখিলে। আমার একটা কথা শুনে কাজ করে দেখ দেখি। কালপ্রাতে স্নান করে ফলমূল খাইও আর কিছু খেও না। সমস্ত দিন একমনে চিন্তা করো কিসে তোমার পরিবারের পীড়া ভাল হবে। মন ও শরীর পবিত্র রেখো—মনে পাপচিন্তা মাত্র স্পর্শ না হয়। সন্ধ্যার সময় একবার তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁকে স্পর্শ করিও। ইহাতে বেশ বিশ্বাস করে কাজ করো, নহিলে করো না।" আমি সম্মত হইয়া আসিলাম।

২রা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাককালে বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তখন তিনি বৈঠকখানার বাহিরে অনাবৃত শরীরে ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবাবু এবং একটি দৌহিত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর রং যে কত ফরসা, মুখ দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার পরিবারের পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতেছে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, সোমবারে মেজদাদা (সঞ্জীববাবু) ফিরিলে একত্রে দেখিয়া আসিবেন। সঞ্জীববাবু মিজমারাইজ করিতে জানেন। বঙ্কিমবাবু নিজের তৃতীয়া কন্যার পীড়ার গল্প করিলেন। ১৫ দিন তাঁর দাঁত খোলে নাই। ডাক্তার কেলি নাসিকা দ্বারা আহার করাইতেন। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতা হইতে হাবড়ার বাসায় লইয়া যাওয়া ভারি কষ্টকর হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ভৌতিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হিষ্টিরিয়া বলিয়াছিল। বলিলেন, তাহাদের ঝাড়া ঝোড়া ও mesmerism, জলপড়া mesmerized water এই সকল উপায়ে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাও। আমার কন্যাকেও mesmerize করার উদ্যোগ হইয়াছিল। যদি কাহাকেও না বল, একটি পরামর্শ দিই। তারকেশ্বরের মানত করিও। তাহাতেও উপকার হয়। আর কার কথা বলিব? জজ ব্রজেন্দ্রলাল শীল ঐ রকমে সারিয়া গিয়াছেন। অনেকেই

Sceptic তাই এসব কথা সকলকে বলি না। কিন্তু অনেক সত্য এতে আছে। তোমার বিশ্বাসের জন্য আরও দু-একটা গল্প বলি। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই শ্যামাচরণ বাবুর কন্যাটির বয়স যখন ৬ বছর। তখন তার শ্বাস কাস ও জ্বর হয়। কিছুতে ভাল হয় না দেখিয়া শ্যামাচরণবাবুর স্ত্রী মেয়েটিকে লইয়া কলিকাতায় আসেন। আমি তখন এখানে সপরিবারে থাকি। মহেন্দ্রবাবু তখন এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি দুই মতেই চিকিৎসা করেন, এত নাম হয় নাই। তিনি ও আর আর ডাক্তারেরা বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন, ঘরে বাতাস মাত্র আসিতে দিতেন না। একটু সাগু মাত্র খাইতে দিতেন। তাও হজম হইত না। প্রাতে আসিয়া মল পরীক্ষা করিয়া প্রত্যহ মহেন্দ্রবাবু সন্দেহ করিতেন যে সাগুর চেয়ে আরও বেশী খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতে কিছু হলো না—মেয়েটি বাঁচে না। নিজে গিয়া আমি তাকে বাড়ী রাখিয়া আসি—রেলের কষ্ট তার সহে কিনা মহেন্দ্রবাবু সন্দেহ করিয়াছিলেন। তারপর বাড়ী গেলে একমাগী কর্তাভজা আসিয়া মেয়েটিকে দেখে বলিয়াছিল যে সেটি কেন তাকে দেওয়া হোক না। তাঁরাও তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। সে যদি কোন উপায়ে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারে তবে মেয়ে তাহারই হবে। শেষে মেয়েটির চিকিৎসা করিতে সম্মত হয়ে বলে যে সে যা বলিবে, তাহাই করিতে হবে। প্রথমে মেয়েটির গলায় একটা কিসের পুঁটুলি বাঁধিয়া দিয়া তাকে পুকুরে স্নান করাইতে বলে। তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, আবার সেই জলে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন থেকে উপকার বোধ হতে লাগল। মেয়েটি ক্রমে বেঁচে উঠ্‌ল। এখন সে বেঁচে আছে, বয়স বিশ বৎসর।" আমি বলিলাম এ সকল ব্যাপারে আমার বড় বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁর "রজনীর" সন্ন্যাসী চরিত্র এবং লর্ড লিটনের একখানি নবেল পড়িয়া বোধ হইয়াছে যে তাহা অসম্ভব নহে। বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন অনেক দেখিয়া তবে তিনি লিখিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের কথা একটু হইল। "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মত ও প্রশংসার কথা বলিলাম। উহার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন বলিলেন "গিয়াছিলাম কিন্তু অভিনয় ভাল হয়নি। তাই, ডাক্তার সরকারকে লইয়া যাইনি নহিলে সরকার যাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" বঙ্কিমবাবু দেশীয় থিয়েটারের উপর বড় চটিয়াছেন, বলিলেন এখন উহা ভদ্রলোকের যাইবার যোগ্যস্থান নহে। কতকগুলো অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হা হা করিয়া হাসে—বড় ত্যক্ত হইয়া আসিয়াছেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, থিয়েটারের উন্নতির জন্য তিনি ম্যানেজারদিগকে উপদেশ পরামর্শ দেন কিনা? বলিলেন, "বেশী নহে, তা বুঝিবে কে?"

এই সময়ে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে এক দিন দেখা করিতে আসেন। তিনি উঠিয়া গেলে রাখালকে বলেন, "ইনি নিশিকান্ত, বড় বিদ্বান।" একটু পরে হাসিয়া বলেন, "আমি ত মন্দ বলতে পারবই না, তিনি য়ুরোপে বসিয়া আমার বই পড়িয়াছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একটু অবনিবনাও হওয়ায় এই সময়ে বঙ্কিমবাবুকে হাবড়ায় পৃথক বাসা করিতে হইয়াছিল—মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যার একটু পূর্বে ফিরিয়া আসেন। আমি আসিয়া দেখি ইজিচেয়ারে বসিয়া তিনি তন্ময়চিত্তে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মত এই যে মস্তিষ্কের পোষণ জন্য প্রচুর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। বলিলেন, তাঁর শরীরে এমন বল নাই যে দশ সের জিনিস তুলিতে পারেন, অথচ অতিশয় অধিক আহার করিয়া থাকেন। হুগলী অবস্থানকালে বাবু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির সঙ্গে দুই দিন কিরূপ ভয়ানক আহার করিয়াছিলেন সে গল্প করিলেন। আপাততঃ তত বেশী খাইতে পারিতেছেন না বটে কিন্তু জাজপুরে থাকিতে তিনি দুই বেলায় চারটে মুরগী, আটটা ডিম ও আর আর জিনিস প্রত্যহ খাইতেন। চারটে মুরগীর কথা শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য হইলে বলিলেন "তাহা এখনও পারি।" বলিলেন "মানসিক শ্রমটা বড় করিতে হয়, এত না খেলে চলে না।" জিজ্ঞাসা করিলাম "যৌবনাবস্থায় কি এমন আহার করিতে পারতেন?" উ—"না, এখন পারি।" কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশী দিন টেঁকিবে? উত্তর—"বলা বড় শক্ত, বোধ হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল।" প্রশ্ন—"বিষবৃক্ষ" কতদিনের লেখা? উত্তর—১৮৭২ সালের। জাজপুরে "দেবী চৌধুরাণী" লিখেছি।" প্রশ্ন—"তা কি শেষ হয়েছে?" উত্তর—"না এখনও হয় নাই।" প্রশ্ন—"আচ্ছা আপনি ত অনেক চরিত্র লিখেছেন, দীনবন্ধুবাবুর নিজের চিত্রিত চরিত্রগুলির অধিকাংশ জীবিত বা মৃত আপনিই লিখেছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি তেমন? উত্তর—"সেই রকম বটে, কিন্তু তার উপর অবশ্য রঙ ফলান।"

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি এক দিনকার কথা। শনিবার, প্রায় পাঁচটার সময় বঙ্কিমবাবুর কলুটোলার বাসায় গেলাম। রাখালের কাছে শুনিলাম "মৃণালিনী"

সপ্তম সংস্করণে অনেকটা বদল হইয়াছে। দুইজনে পুরান ও নূতন পুস্তক লইয়া মিলাইতে লাগিলাম দেখিলাম পুরান পুস্তকের দুই অধ্যায় একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কয়টি মাত্র কথায় দুই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র পরিহারের চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি রাখালকে বলিলাম, বইটা নাটক ও ভাষাংশে আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু একাংশে সাধারণের বোধহয় কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটক লেখার সাময়িক পর্যায় ঠিক করিয়া আধুনিক সমালোচকগণ তাঁহাদের মানসিক ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে পরবর্তী লেখকদের সে সুবিধা ঘটিবে না। একটু পরে বঙ্কিমবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্চে?" এবং আমার প্রশ্নমত বলিলেন, মৃণালিনীর অনেক বদলাইয়া দিয়াছেন। তখন আমরা উভয়ে ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে বারাকপুরে সুরেন্দ্র-বাবুর অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহেবদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারের বৃত্তান্ত পড়িতে-ছিলাম। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া সুধাইলেন—"বারাকপুরের লড়াই পড়চ না কি?"

আজ নিতান্তই সামান্য কারণে তাঁহাকে অতিশয় রাগিতে দেখিলাম। শুনিলাম আগে এমন ছিলেন না। মালদহে থাকিতে মাথার ব্যারাম হয়, সেই হইতে রাগ হইয়াছে, ইহা আর সুধাইল না। মালদহে মাথার পীড়ার ইতিহাস এইরূপ:—যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানে নাকি পূর্বে নরবলি হইত। পরিবার সঙ্গে ছিল না। একদিন এক কুঠরীতে বসিয়া আছেন, কে আসিয়া ভয়ানক বেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। কেরে? কেরে? করিয়া বঙ্কিমবাবু চীৎকার করিলেন। উত্তর নাই। চাকরেরা আসিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সেই হইতে মস্তিষ্কের পীড়ার সূত্র। পরদিন কাছারীতে লিখিতে লিখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

"প্রতিনিধি" নামক সংবাদপত্রে আমি "কুন্দ নন্দিনী" চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য চরিত্র, তার অত বিশ্লেষণের দরকার ছিল না আমি বলিলাম, এক বিষয়ে চরিত্রটি আমার কাছে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়—উহার নিশ্চেষ্ট সরলতা। কোথাও আর অমন চিত্র দেখি নাই। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি তিলোত্তমার চরিত্রতেও একটু তাহা দেখাইয়াছি।" আমি বলিলাম, কুন্দে তাহার বিকাশ অনেক বেশী। আমি বলিলাম আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্য সৃজন শক্তি এখন বাড়িতেছে।

বঙ্কিমবাবু—হাঁ দেখিয়াছি সে কথা সেদিন তুমি কুন্দ চরিত্রের শেষে লিখিয়াছ। চন্দ্র বাবুও তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধ হয়। মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক, থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দশা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।" আমি বলিলাম, এইবার কেন একবার নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন না? উত্তর—"লিখিব কার জন্য? তেমন শ্রোতা নাই, অভিনেতা নাই, তারপর নাটকের ভাষা তখনও হয় নাই।" আমি বলিলাম আপনার কাজ আপনি করিয়া যান, পরে লোকে বুঝিবে।" সম্মত হইলেন, নাটক লিখিতে চেষ্টা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার ইতিহাস লেখার কি হইল? উত্তর—"এখন ও সব হয় না! যদি কখন চাকরী ছাড়িয়া কোন লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়িতে পাই, তবে লিখিব। এখন কিছু হয় না। তোমরা ত পাঠক বাড়াইতেছ, তখন একবার দেখা যাবে।" কথা উঠিল, আজ কাল লোকের হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থা বাড়িতেছে সে সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাস "সেবারে আপনি মিল, ডার্বিন ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু কাজ হইয়া থাকিবে।" বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, তাঁর আনন্দমঠ এবং হেষ্টির সঙ্গে তর্কবিতর্কের পত্রগুলি কতক কাজ করিয়া থাকিবে। তারপর তাঁর ইংরেজী লেখার কথা হইল। বলিলেন, বরাবর বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।

আমার বঙ্গদর্শন গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন "শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, সে হবে না।" আমি বলিলাম. বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল বরাবর ত চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে। উত্তর—"নবেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব নমাসে ছমাসে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবা পুরুষ অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে বঙ্গদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজ্ দাদাও খান। ....সেবারে দুইমাস বঙ্গদর্শনের টোন্ বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬। ৭ মাস লিখি নাই।..............আমি বলিলাম "আপনি কেন সম্পাদক হোন না? উত্তর—"আর আমার সে উৎসাহ নেই।"..............আর একদিন চন্দ্রনাথবাবু "বঙ্গদর্শনের" কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন

"শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।" বঙ্কিমবাবু 'অস্বীকার হইয়া বলিলেন "তা হলে বঙ্গদর্শন ছাড়িব কেন? তা হলে আর কাহারও সহায়তা লইতাম না! শ্রীশবাবুকে সন্ধ্যার পর এসে গণেশ হইতে হইত।"……
……একটু পরে খিদিরপুর হইতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উকীল উমাকালী বাবু আসিলেন। খাজানার আইন বিলের আন্দোলন জন্য ইংলণ্ডে লর্ড লিটনকে মুরুব্বি খাড়া করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমবাবু যোগেন্দ্রবাবুকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবুকে পান লইয়া খাইতে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এখন পানে দিলে মন।" খুব হাসি চলিতে ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু আমারই মত শ্রোতা—বড় কিছু বলিতে ছিলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন "সুন্দর অর্থে ভাল নহে" ইহা কি ঠিক? চন্দ্রবাবু স্বীকার করেন না। উত্তর—"কোথায় লিখিয়াছি?" আমি—"বৃত্র সংহারের সমালোচনায়।" উত্তর—"ভুল লিখিয়াছি।" আমি কার্লাইলের কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তাঁরও সেই মত Beautiful includes good.

আমি বলিলাম, আমার ইচ্ছা আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি? বঙ্কিম বাবু হাসিলেন, বলিলেন আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নহে! জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দু ধর্ম্মে আমার মতি-গতি অতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কলেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখন ভাল লাগিত না—বড়

অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি। নীতিশিক্ষা কখন হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।" বঙ্কিমবাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম "শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?" উত্তর—"কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রঙ্ ফলাইতে হয়েচে"। একটু পরে বলিলেন, "চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ-স্বরূপা। আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, স্ত্রীচরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশী। পুরুষও কয়টি অতি সুন্দর আছে। অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিমাবাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, অমরনাথ আর প্রতাপ একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী, কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃ সংযম করিতে পারিয়াছিলেন। বলিলেন, পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, অনেকে কপালকুণ্ডলাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে। উত্তর—"হ্যাঁ, কাব্যাংশে খুব উচু বটে"। তারপর নিজেই বলিলেন, "প্রথম তিন খানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশ-নন্দিনী লেখার আগে আইভানহো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিণীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি"। চন্দ্রশেখরের কথা উঠিল। আমি বলিলাম, ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন উৎকর্ষ আপনার আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। সেই "অগাধ জলে সাঁতারের" মত সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য বড় দুর্লভ। আমার কথা স্বীকার করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন "অগাধ জলে সাঁতারের" মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" নিজের জীবনী সম্বন্ধে বলিলেন, অন্যায় কাজের মধো মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি সে জন্য কখন কোন দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বসিলে একটু অপব্যবহার না হয় এমন নহে। প্রশ্ন—"মদে আপনার শারীরিক কোন অসুখ হয় না?" উত্তর—"না, বরং মদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হোক, আমাদের মতন লোকের নিকট হইতে এটা বড় কু-দৃষ্টান্তের কাজ করে। সেবার ডাক্তার গুরুদাস যখন বহরমপুরে ছিলেন, কতকগুলি কলেজের ছাত্রকে

মদ খাওয়াবার জন্য তিরস্কার করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন "দোষ কি মশায়? অন্যায় কাজ হ'লে বঙ্কিমবাবু করিবেন কেন?" গুরুদাসবাবু আমার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি যেন ওটা ত্যাগ করি। দুই একবার ত্যাগও করিয়াছিলাম"। রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন? উত্তর—পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী "গিফ্‌টেড্" কিন্তু "পৃকোসাছ্", এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সে দিন রবিকে বলেছি। রবি বলেন, আপনিও ত অল্প বয়সে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন। আমি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" লিখি, তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর। * * আমি বলিলাম এই বয়সে দুইবার ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়াও আমার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ সুবিধা। উত্তর—"তাতে উপকার হয়েছে কিনা জানি না। আমার ইচ্ছা আছে, পেনসেন লইয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া একবার ইউরোপ যাব।" * * নিজের সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আবার বলিলেন, "এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই ব'ল ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরাজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল "প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক পুরুষ"। আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক "আনন্দ-মঠেই" সাহেবেরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।" ইডেন সাহেবের কথা উঠিল। বলিলেন "লোকটা যেমনই হোক, খুব বুদ্ধিমান। একদিন বলিয়াছিল আপনার বই খুব পপুলার, অনেক বোধহয় বিক্রয় হয়। আমি উত্তর করি, আমাদের দেশ বড় গরিব, বেশী বিক্রী হয় না। ইডেন সাহেব—"২।৩ টাকায় এক কাপি বিক্রয় করিতে পারেন না?" তখন আমার কাছে শুনিলেন যে এক-টাকা দামেও লোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না ইডেন সাহেব আর কিছু দিন এখানে থাকিলে আমার কাজ কর্ম সম্বন্ধে ভাল হতো"। অন্যান্য সাহেবদের কথা হইল। অনেকে বঙ্কিমবাবুকে বলে, এদেশে এই লোকটাই অদ্ভুত শক্তিশালী। কথাপ্রসঙ্গে শুনিলাম রিয়াক্ সাহেব হোমিওপ্যাথ লোকনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্যই কি হেষ্টির বিরুদ্ধে পত্রগুলা বঙ্কিমবাবুর নিজের লেখা?

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।" নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, "সাম্যটা" সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে কিন্তু আর ছাপাব না। প্রবন্ধ পুস্তকেও অনেক ভুল, সেটাও ছাপাব না। তবে ভিন্ন পুস্তকাকারে উহার কয়টা প্রবন্ধ দিব।

পূজার সময় নবমীর দিন কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, চন্দ্রনাথবাবু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা আহার করিতে বসিলে বঙ্কিমবাবু লেবু পরিবেশন করিলেন। নীচে কাঙ্গালী ভোজন হইতেছিল, হাসিয়া বলিলেন "দেখ চন্দ্র, নানারকম রূপ, দেখিলে আর খেতে পারবে না।" বঙ্কিমবাবুর প্রথম যৌবন কালের একখানি ছোট ফটোগ্রাফ্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতীশচন্দ্র আমায় দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন এখানি "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিবার আগের ছবি। বঙ্কিমবাবুদের বংশ বৈষ্ণব, পূজায় আমিষের সম্বন্ধ নাই। এক মেছুনী মাছ লইয়া দরওয়াজায় ঢুকিল, বঙ্কিমবাবু সেদিকে আসিতেছিলেন, একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "মাছ নাবাস্‌নে, আজ মাছ আনতে নেই।" জ্যোতীশ বলিল "যা কখন হয়নি, তাই করলি ?"

বাহিরের বৈঠকখানায় টেবিলের উপর বঙ্কিমবাবুর আর একখানি বড় ফটো দেখিলাম। খুব অল্প বয়সের ছবি, রবিবাবুর প্রথম বয়সের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের মত চুল, মুখের চেহারাও অনেকটা সেইরূপ,—এখন কিছু মেলে না। চন্দ্রবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখনকার চেহারার সঙ্গে কিছু কি মেলে ? আচ্ছা বলত, এখনকার চেহারা ভাল কি তখনকার ?" আমি তখনকারটাকেই পছন্দ করিলাম। চন্দ্রনাথবাবু হাসিয়া আমার মতে মত দিলেন। বঙ্কিমবাবুও হাসিলেন, বলিলেন "ওকথা মেজ্‌বাবু স্বীকার করেন না, বলিলে মারিতে আসেন।"

॥ দ্বিতীয় প্রস্তাব ॥

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল "সাধনা"য় "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ" লিখিয়াছিলাম। তখন ইচ্ছা ছিল, আরো কয়টি প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আমার সংগ্রহ এবং জানা আছে, সাধারণে প্রকাশ করিয়া তদীয় ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিয়া দিব। নানা কারণে এতদিন সে মহৎ সঙ্কল্পের অনুসরণ করিতে পারি নাই—আজিও পারিলাম না। বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়টি মাত্র কথা বলিবার অবসর পাইব।

১৮৮৫ অব্দের পূজার পূর্বে "প্রচার" পত্রে "কৃষ্ণ চরিত্রের" যে অংশ প্রকাশিত হয় তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহার রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল; পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত, যুদ্ধে প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারী অসংগত বলিয়া মনে হয়। ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইয়াছিল এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে হিংসাবৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক অথচ হিংসার মত সমাজ-বিরোধী (Anti social) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন ইহা তাঁহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সেই সময়ে রবীন্দ্রবাবু ও আমার সম্পাদিত "পদরত্নাবলী" মুদ্রিত হইয়াছিল এবং আমি উহার এক খণ্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। কিছু দিন পরে নদীয়া জেলায় প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া যাই। পলাশীর অদূরে কালীগ্রামে অবস্থানকালে বঙ্কিমবাবুর পত্রোত্তর আমার হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ চতুর্দশ বৎসরের কথা—কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে। পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রিয়তমেষু।

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নব জীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা William the Silent)। ধর্ম যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণ চরিত্র মনুষ্য চরিত্র, ঈশ্বর লোক হিতার্থে মনুষ্য চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এইখানে একটি কথা মনে পড়িতেছে। "পদরত্নাবলী"র ভূমিকা লেখা শেষ হইলে একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তাহার শেষ দিকে এক স্থানে আছে:—"যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বৎসল ভাব, ব্রজরাখালের সেই চল চল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ যার বলে—

"দুগ্ধ স্রাব পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে"।

সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস তাহার নীচের এই সব পরদা, তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন। "চল চল বালসুলভ

সখ্যে”র স্থলে আমি লিখিয়াছিলাম “ঢল ঢল ছেলেমি সখ্য”। শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “দেখতে পাই রবীন্দ্রের ও তোমার লক্ষ বাঙ্গালায় সংস্কৃত মাত্র বর্জন ক’রে কেবল চল্‌তি কথা চালান।” তাঁহার সঙ্গে কখন তর্ক করিতে পারিতাম না, অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে বলিলাম “কি করতে হবে?” বঙ্কিমবাবু—“ছেলেমি”র জায়গায় “বালসুলভ” কর। বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য কতটা ঠিক তাহা তখনকার “বালক” পত্রের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই চৌদ্দ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা বলে নূতন পথ খনন করিয়া পদ্য ও গদ্যের ভাষায় অভূতপূর্ব ঝঙ্কার ও ওজস্বিতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আমি কিন্তু আজিও সোজা সরল ভাষার মোহ সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই।

সরস্বতী পূজার দিন কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন কলুটোলায় সেন মহাশয়দের বাড়ীর কাছে তাঁহার বাসা। উপরের বৈঠকখানায় পীড়িত শ্যামাচরণবাবু শয্যাগত, নীচে রাখালের ঘরে এক পার্শ্বে সঞ্জীববাবুও রুগ্নশয্যায়, কাছে বঙ্কিমবাবু, রাজকুমারবাবু এবং ঔপন্যাসিক দামোদরবাবু বসিয়াছিলেন। শেষোক্ত কিছু দিন পূর্বে শ্যামাচরণ বাবুর বৈবাহিক হইয়াছিলেন; অতএব উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া নূতন বৈবাহিকের সঙ্গে রহস্যে রহস্যে আমাদিগকেও আমোদিত করিতেছিলেন। সঞ্জীববাবুর তামাসার মাত্রা কিছু বেশী বেশী, বঙ্কিমবাবুর ততটা নহে, তিনি বরঞ্চ বার বার বলিতে লাগিলেন—“ছেলে মানুষের সঙ্গে ওসব কেন? রাখালের বয়সী বা কিছু বড় বইত নয়।” কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তবু ছাড়েন না। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন—“বিধাতা কেন যে আমায় দুজনার ছোট করেছিলেন, জানিনে।”

দামোদরবাবু উঠিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমায় সুধাইলেন “তুমি পলাসীতে কি কি পেয়েছিলে, আমায় লিখেছিলে?” আমি যুদ্ধক্ষেত্র ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে গোলা ও গুলি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম—লাক্ষাবাগের অবশিষ্ট একমাত্র আমগাছের ছোট একখণ্ড কাষ্ঠও পাইয়াছিলাম। তাহার পরিচয় দিয়া বলিলাম “দেখবেন?” বঙ্কিমবাবু—“দেখে আর করব কি? কেবল কাঁদা বইত নয়।” কথায় কথায় আমি বলিলাম “কীর্তন সম্বন্ধে এবার কতক অনুসন্ধান করে এসেছি।” বঙ্কিম বাবু “ওসবে কিছু হবে না। এখন ভবিষ্যতের একটা ভিত্তি করতে হবে।” আমি—“সে আপনি করুন, আমাদের সাধ্য কি?” বঙ্কিম বাবু—“সেই চেষ্টাইত করচি। কেমন শ্রীকৃষ্ণের উপর

ভক্তি কিছু হল?" আমি স্বীকার করিলাম এবং বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ যে কাব্যের সৃষ্টি বলিয়া আমার ধারণা হইতেছিল, তাহা বলিলাম। তিনি এ কথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন "গীতায় এক জায়গায় মাত্র দেখি রাসাধ্যায়ে 'গোপীরমণ।' রাসের অর্থ আমি এই রকম বুঝি, তখন স্ত্রীজাতির বেদাদিতে অধিকার ছিল না অথচ তাহাদের শিক্ষা চাই; শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, কলা বিদ্যার দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। ইহার বেশী আর কিছু নয়।" ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু বোধ হয় কৃষ্ণচরিত্রের পরবর্তী সংস্করণে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পূর্বে স্ব সম্পর্কীয় স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এরূপ সৌহার্দ্য যে বঙ্কিমের মাতৃবিয়োগের পর তিনিও তাঁহাদের বাড়ী গিয়া কাচা পরিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু আমায় একবার বলিয়াছিলেন, জগদীশবাবু তাঁর চেয়ে অন্তত পনর বছরের বড়। অথচ সমবয়স্কের মত তাঁহাদের বন্ধুতা ছিল। সাহিত্যানুরাগী পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না, বঙ্কিমবাবু ইঁহার নামে "বিষবৃক্ষ" উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৮৯১ অব্দের শরৎ কালে সীতামাটি হইতে কাঁথি বদলী হইবার সময় বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখিতে যাই। অল্পদিন মাত্র তখন তিনি পেন্সেন লইয়াছিলেন, শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণ বাবু কাছে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম "আগে বলতেন পেন্সেন লইয়া খুব লিখিব—এখন?" মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।" বলিলেন "রমেশকে (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) বলেছি দিন কতক রঘুনাথপুরের বাঙ্গালায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে। কিন্তু সেখানে আবার জলের কষ্ট—বেশ হল, কাঁথি হতে তুমি ভাল ডাব পাঠাতে পারবে।" কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়া হয় নাই। স্থানটি আমার দেখা হয় নাই, কিন্তু শুনিয়াছি ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি চমৎকার। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সময় বাঙ্গালার চারিধার জলে পূর্ণ হইয়া যায়—অদূরে জমীদার ভুঁইয়া মহাশয়ের বাস-ভবনের চারিদিকে দূরবিস্তৃত ঘন বাঁশবনের প্রাচীর, তাহাতে নির্ভয়ে হরিণযূথ ও ময়ূর ময়ূরীগণ বিচরণ করিতেছে। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি অপরাহ্নে এই জীবগুলিকে

স্বহস্তে আহার দান করা ভুঁইয়া মহাশয়ের দৈনিক কার্য এবং সেই সমুদ্রবেলাভূমে তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণের বিঘ্ন না হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি সে অঞ্চলে শিকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছেন।

কাঁথি মহকুমার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয় পুত্রগণের নাম তখনও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে—কেননা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাজনামুঠা পরগণার বন্দোবস্তের অবসরে সাধারণ লোকের বিস্তর হিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মেদিনীপুর অবস্থিতি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানকার জেলাস্কুলে পড়িতেন। তাঁহার হেড মুহুরি সেদিনও বাঁচিয়া ছিলেন, বছর কতক হইল প্রায় শতবর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-চপলতার অনেক গল্প করিতেন। ফলতঃ কপালকুণ্ডলার অনেক দৃশ্যের জন্য যে বঙ্কিমবাবু কাঁথির সুন্দর বালুকা শৈলশ্রেণী এবং সাগরোপ-কূলের কাছে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁথি হইতে ছয় মাস পরে বীরভূম বদলী হইবার সময় আবার কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পিতার হেড মুহুরির ও তাহার সন্তান-সন্ততির কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম সাধারণতঃ মাজনামুঠার সকল লোকেই এখনও তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করে। তাহাতে সলজ্জ ও স্মিত মুখে বঙ্কিমবাবু বলিলেন "কর্তাদের দয়ার জন্য লোকে ভালবাসিবে। আমরা বিচার করিয়া কড়া শাস্তি দিতাম তাতে লোকে কর্তার সঙ্গে তুলনা করে আমাদের নিন্দা করিত।"

মনে পড়িতেছে, নবীনবাবু একবার পুরী অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিতেছিলেন যে, তিনি গোটাকতক উড়িয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন, পড়িয়া শুনাইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন কি না? বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন "উড়ে ভাবা আমি বুঝতে পারব না? ছেলেবেলায় দশ বার বছর পর্যন্ত উড়ের হাতে লালিত পালিত—আমি আর উড়ে বুঝতে পারব না?" মেদিনীপুর বিশেষতঃ কাঁথির উপর বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক টান ছিল। কিন্তু সাধারণ উড়িয়াবাসীদের প্রতি তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। আমার কাঁথি যাওয়ার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্মটি এইরূপ—"সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখিয়া ভুলিও না।"

আমার কৃষ্ণনগর যাওয়ার কিছুদিন আগে রাখালের হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়। বঙ্কিমবাবু নিজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় পদ্ধতি মতেই চিকিৎসা করিতে পারিতেন। স্বয়ং সচরাচর

ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া লইতেন। সে যাহা হউক অন্যান্য চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন রাতে আমায় চিঠি লিখিলেন যেন প্রাতে আমার আত্মীয় স্বর্গীয় সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন খুড়া মহাশয়কে লইয়া যাই। তিনি হোমিওপ্যাথির মত ছোট শিশিতে ঔষধ রাখিতেন দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—"দেখি দেখি এ যে ঠিক হোমিওপ্যাথির মত।" আমি বলিলাম "উনি দুই তিনটা ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়া চিকিৎসা করেন—তাহাতে বেশ উপকার হয়। এটা বেশ উন্নত পদ্ধতি।" বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন "হোমিওপ্যাথি মতে প্রত্যেক ঔষধ পৃথক্ ব্যবহার করা উচিত, তাহাতে উপকার হইতেছে। সে পরীক্ষার পর ইহাকে উন্নতি বলিতে পারি না।" যাহা হউক প্রশংসিত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার উপর তাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল।

একবার সুলেখিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর সংস্কৃত নাটক আলোচনার কথা তুলিয়া বঙ্কিম বাবু আমার অনুজ শ্রীমান শৈলেশচন্দ্রের সম্মুখে আমায় বলিয়াছিলেন "লেখিকার বয়স বিবেচনা করিলে বলিতে হয় ও বয়সে আমাদেরও অমন লেখা সহজ হইত না।" তাঁহার সমালোচনা পড়িয়া নাটকগুলি আবার নূতন করিয়া পড়িতেছি। শৈলেশ বলিলেন "আপনি আর ত কিছু লিখিতেছেন না!" বঙ্কিমবাবুর বাটীর তখন সংস্কার হইতেছিল, হাসিয়া বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন "এখন আমারও লেখা ঐ রকম, কেবল পুরাতনের মেরামত ও চুণকাম।"

১৮৯২-৯৩ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে রবিবাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ "সাধনায়" প্রকাশিত হয়। আনন্দমোহনবাবু ও বঙ্কিমবাবু উহার অনুমোদন করিয়া রবি বাবুকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। চিঠি দুখানি পরে "সাধনায়" বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু সিণ্ডিকেটের উপর যথেষ্ট ভক্তিমান ছিলেন না এবং চিঠিতে একটি মাত্র বিশেষণে না রাখিয়া ঢাকিয়া সে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবিবাবু কথাটিকে তেমন উন্মুক্ত ভাবে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "ইচ্ছা করিলে ওটাও ছাপিতে পারেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।" সে কণ্ঠে যে মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা ধ্বনিত হইয়াছিল আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। বলিলেন "আনন্দমোহনবাবু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিপক্ষতা করেন মুসলমান সভ্যেরা এবং মহামহোপাধ্যায়ের দল।" এই খানে বলা আবশ্যক

যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নীলমণিবাবু তখনও মহা-মহোপাধ্যায় হন নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর সরস্বতী পূজার বিসর্জন দিনে বীরভূম হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। শৈলেশচন্দ্র আমার সঙ্গে ছিলেন। তখন জানিতাম না যে ইহ জীবনে সেই শেষ সাক্ষাৎ। রাজসিংহের নূতন সংস্করণের কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন তাঁহার মতে তাহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে বোধ হয় তাহা বুঝিতেছে না। স্নেহের শেষ চিহ্ন স্বরূপ এক খণ্ড পুস্তক উপহার দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেন একটা সমালোচনা করি। আমারও সে বাসনা হইয়াছিল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময়াভাবে নিজে আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে সেই উপহৃত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই যোগ্যতর সমালোচক "সাধনায়" তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু তখন অন্তিম শয্যায়, সম্ভবত পড়িতে পারেন নাই। এইখানে বলা ভাল যে মত বিরোধী সমালোচনা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিল না, এ বিষয়ে তাঁহার কাছে অতি বড় পাণ্ডিত্য অথবা বন্ধু বাৎসল্যের কোন মূল্য ছিল না। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাহা জানিতেন।

আমি বিদায় হইবার কিছু পূর্বে বঙ্কিমবাবু বলিলেন "আবার কিছু লিখ্‌ব লিখ্‌ব ভাবচি—কি লিখি বলত?" আমি একটু হাসিয়া উপন্যাস লিখিতে বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বুঝিলেন যে তাঁর ধর্মালোচনার চেয়ে কাব্যালোচনার আমি তখনও পক্ষপাতী, হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমিও তাই স্থির করেছি, এবার একটা বৈদিককালের স্ত্রী চরিত্র আঁকিব, ঐ দেখ খাতা বেঁধেছি।" জানিনা সে খাতায় তাঁহার অমর লেখনী স্পর্শ হইয়াছিল কিনা।

॥ তৃতীয় প্রস্তাব ॥

....

১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে সাবিত্রী লাইব্রেরির বাৎসরিক সভায় বঙ্কিমবাবু সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বক্তা বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু এবং বক্তৃতার বিষয় "আমাদেব অভাব।" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার শীঘ্র কার্যান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন বলিয়া বঙ্কিমবাবু প্রভৃতিকে ঠেলিয়া অধিবেশন স্থানে পাঠাইলেন। "বন্দে মাতরং" গীত এবং প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হইলে পর উপরের বারান্দা হইতে একটি বালিকা "ঐ ঐ" বলিয়া চীৎকার করিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—গোধূলির তরল ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। সকলেই চাহিয়া দেখিলেন যে সভাপতির মাথার উপর যে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল সহসা তাহা ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় স্থান ছাড়িয়া পলাইলেন—সেই অবকাশে সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু ও চন্দ্রনাথ বাবুদের সঙ্গে আমিও বাহিরে আসিলাম। ডাক্তার সরকার চলিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়া হাসিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "ডাক্তার যেখানে রোগী সেখানে!"

একদিন সন্ধ্যার পর কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বিজ্ঞানে action reaction যেমন, কাব্যেও কি ঠিক তাই?" উত্তর "ঠিক তাই।" তোমার সঙ্গে সেক্ষপীয়র পড়িতে পারি ত বেশ বুঝাইতে পারি। ক্লিওপেট্রার সে কথা মনে আছে কি Have I the aspic in my lips? সেই reaction, ওথেলোতে ইয়াগোতে সেই কথাবার্তায় action. এণ্টনি ক্লিওপেট্রার এণ্টনির সঙ্গে জেনারেলের ঝগড়া action reaction. ম্যাকবেথের knocking scene সেই action reaction. ইহার পর পর ব্যাণ্ডম্যানের ম্যাকবেথ অভিনয়ের কথা উঠিল।

১২৮৯ সালের শেষভাগে ইণ্ডিয়া ক্লাবের সাধারণ অধিবেশনে দেশের বড়-লোকেদের সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। তখন ইলবার্ট বিলের আমল সাহেবদের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা রেষারেষি ঘেষাঘেষির ভাব প্রবল হইতেছিল। সেই অধিবেশনে সে কথারও আলোচনা হইয়াছিল। বঙ্কিমবা

মন খুলিয়া নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সেই সূত্রে যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মন্দ নহে। ঐরূপ দলাদলির ফলেই আমাদের উন্নতি—আপনা হইতে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে সে ভালই হইয়াছে। বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন, একটু রাখিয়া ঢাকিয়া তিনিও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদার ভাব বঙ্কিমবাবুর চরিত্রে যেরূপ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল, রাজকর্মচারীদের ভিতর তাহা সচরাচর সুলভ নহে। স্বর্গীয় শ্যামাধব বাবু বলিতেন উর্ধ্বতন কর্মচারীদের সহিত অতি কম বাক্যে এবং ব্যবহারে সর্বদা তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। হুগলীতে নূতন নূতন আসিয়া শ্যামাধববাবু একদিন ১১টার আমলে কোন বড় সাহেব সন্দর্শনে চলিয়াছেন। ছুটির দিন ধড়াচূড়া আঁটিয়া প্রখর রোদে তিনি ছুটিয়াছেন, বঙ্কিমবাবুর বারান্দার সম্মুখে তাঁহার সামনে পড়িয়া গেলেন। "এত রৌদ্রে ব্যস্ত হয়ে কোথা যাও শ্যামাধব ?" ব্যাপার বুঝিয়াও বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তর শুনিয়া হাসিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে গলদঘর্মাবস্থায় শ্যামাধববাবু গৃহে ফিরিতেছেন, আবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন "শ্যামাধব, আমার ইচ্ছা তোমার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আর একটু বাড়ে।"

কেশববাবুর স্বর্গারোহণের পরবৎসর এলবার্ট কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পার্শ্বে বঙ্কিমবাবু উপবিষ্ট ছিলেন। মিত্র মহাশয় উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলে কোন দেশবিশ্রুত ব্যক্তি স্মিতমুখে কখনও বা হাস্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া মাথা নাড়িয়া তাহার প্রত্যেক কথার অনুমোদন করিতেছিলেন। বক্তৃতা সরস হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে হাস্যরস সঞ্চারের বিশেষ অবসর ছিল না। সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই উন্নত নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাস্যপটু শ্রোতা মহাশয়ের আপাদমস্তক লক্ষ করিতেছিলেন। "মুচিরাম গুড়ের জীবনী" সম্ভবত ইহার পরেই ছাপা হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শন আমার হস্তে আসিবার কথা ঠিক হইয়া গিয়াছে এমন সময় অক্ষয়বাবু চুঁচুড়া হইতে একদিন কলিকাতায় আসিলেন। কলুটোলায় বঙ্কিমবাবুর বাসাটি তাঁহার জানা ছিল না, আমি সঙ্গে করিয়া গেলাম। সামান্য জ্বর হওয়ায় বঙ্কিমবাবু সেদিন কাছারী যান নাই। কি আহার করিয়াছেন অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করায়

বলিলেন, "লুচি ভাজিতে বলেছি খাব এখন।" অক্ষয়বাবু বলিলেন, "রাঢ়দেশে নিয়ম জ্বর হইলেই গৃহস্থের ঘরে মুড়ির খোলা চড়ে।" বঙ্কিমবাবুকে 'ব্রাইড অফ লেমার মুর' পড়িতে দেখিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম, "এসব বই এখনও আপনি পড়েন।" আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, "এসব বই কি কখন পুরাণ হয় ?" তারপর বঙ্গদর্শনের কথা উঠিল। অক্ষয়-বাবুকে বলিলেন—'শ্রীশবাবু বঙ্গদর্শন নিলেন, তোমরা লেখ।" "কেন, আপনি ?" "আমিও লিখব, তবে বুড়ো হলাম কত আর লিখব ?" হাসিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন, "এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে তায়।" বঙ্কিমবাবু উচ্চহাস্য করিলেন।

উত্তরপাড়ার হিতকারী সভার যে বাৎসরিক অধিবেশনে প্রতাপবাবুর বক্তৃতায় সভাপতি বীমস সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া যান, বঙ্কিমবাবু সেদিন সেখানে বৈবাহিকগৃহে উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর রাত্রে এক ভাড়াটিয়া গাড়িতে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমরা কলিকাতা ফিরিতেছিলাম। গাড়ি ছাড়িতেছে এমন সময় উকীল ভৈরববাবু ট্রেন ফেল করিয়া আসিলেন। আমাদের গাড়ি পূর্ণ, ভৈরববাবুর স্থান হয় না। আমি সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ, বিশেষত ভৈরববাবু আমার পিতৃবন্ধু, বঙ্কিমবাবুকে আমি বলিলাম যে তিনি ভিতরে বসুন, আমি কোচবাক্সে যাব। শীতকালের রাত্রি, ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার অসুখ করিবে বলিয়া বঙ্কিমবাবু বারম্বার তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং আমি নিতান্ত জেদ করিলে নিজে ধরিয়া আমায় কোচবাক্সে উঠাইয়া দিয়া তবে গাড়িতে প্রবেশ করিলেন। পথে ডাকিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কষ্ট হইতেছে কিনা এবং গাড়ি থামিলে নিজে আসিয়া আমায় নামাইয়া লইলেন। বাসায় ফিরিয়া রাখালকে আমার কথা অনেকবার বলেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন হয়তো আমার অসুখ করিবে।

এই স্নেহপ্রীতির গভীরতা তাঁহার স্বসম্পর্কীয়গণ সম্বন্ধে কত বেশি ছিল সহজেই বুঝা যায়। ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতীশ সংসার রাজ্যের ফেরফাঁকর কখনই বুঝে না, তার জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। আমাদের বীরভূম অবস্থানকালে যখনই কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, জ্যোতীশের উদাসীনভাব লক্ষ্য করিয়া বারম্বার আমায় বলিতেন, তাকে সর্বদা দেখিও। রাখালের অসুখবিসুখ করিলে বড় বিচলিত হইতেন।

সাহেব সুবার ছায়া কখন বড় ইচ্ছা করিয়া মাড়াইতেন না, জামাতৃস্নেহের

আধিক্যবশত ইদানীং দুই একবার সে নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন। নবজীবন বাহির হওয়ার মাস দুই মধ্যে প্রচারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। দুইখানি মাসিকপত্র ভাল চলিবেনা বলিয়া বঙ্কিমবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু কয়জন তাঁহাকে শেষোক্ত উদ্যম হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানত রাখালকে লিপ্ত রাখার জন্যই প্রচারের সৃষ্টি, তাহাকে কোন কার্যোপলক্ষে দূরে পাঠাইতে ইচ্ছা ছিল না। বন্ধুগণ নির্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করায় স্নেহার্দ্রস্বরে বলিয়াছিলেন, "রাখাল কাছে না থাকিলে কি লইয়া থাকিব?" হেমবাবু সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন—হাসিয়া বলিলেন "বঙ্কিম আমায় পোষ্যপুত্র কর ভাই।" ভারি হাসি পড়িয়া গেল!

দৌহিত্রগণের প্রতি স্নেহ মায়ায় তাঁহার জীবন মধুময় হইয়াছিল। রাখালের যমজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না, রাখালকে বলিতেন, তাদের লইয়া তাঁর আর লেখাপড়া হয় না। একটি ছেলের অভাব হইলে তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়াছিলেন—তাহার উদ্দেশে পুস্তক উৎসর্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন স্বর্গে মর্তে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ! জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সীধুকে যত্ন করিয়া হার্মোনিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে বন্ধুবান্ধবগণের সমক্ষে তাহার আলোচনা করিলে ভারি আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্বে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একদিন দেখা করিতে যাই। বালক সীধু বাটির সন্নিহিত গলিতে বল লইয়া ছুটা-ছুটি করিতেছিল, মাতামহের উপর্যুপরি আহ্বানে আসিল বটে, কিন্তু খেলার বিঘ্ন হইয়াছিল, মুখ ভার করিয়া রহিল। দাদামহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধ শ্রীশবাবুকে একবার হার্মোনিয়ম শুনাও, সীধুর মন তখনও কিন্তু খেলার দিকে ছিল সে বাজনায় তেমন ঘেঁষিল না। তাঁহার সেদিনকার স্নেহকোমল মুখচ্ছবি এবং আগ্রহ অনুরোধের মিষ্টহাসিটুকু আজিও আমার মনে জাগিতেছে।

ঐদিন বলিয়াছিলেন যে 'সখা' নামক বালক পাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁর বাল্য জীবনের যে বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অনেকটা ঠিক। সত্য সত্যই কয় বৎসর তিনি বৎসরে দুইবার ক্লাস প্রমোশন পাইয়াছিলেন। মধ্যম দৌহিত্র বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাসে প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হইতেছে, অতএব সম্ভবত তাঁর ছাত্রজীবনের গৌরব কতক সে রক্ষা করিতে পারিবে, সোৎসাহে এরূপ ভরসা করিয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে কলুটোলার বাসায় একদিন সন্ধ্যার পর কয়জন মফঃস্বলের বাবু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পার্শ্বের দিক

হইতে শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল "ঠাকুরদাদা হে ?" উত্তর "কেন হে ?" প্রশ্ন "কি কচ্চ হে ?" সকলে হাসিয়া উঠায় শিশু অপ্রতিভ হইয়া গেল, আর অগ্রসর হইল না এই শিশু রাখালের দ্বিতীয় পুত্র, আদরের ডাক নাম মুটু। মুটু দেখিতে অনেকটা মাতামহের মত।

ছেলেরা একটু একটু বড় হইলে বাপের কাছে মাঝে মাঝে ধমক খাইত। কাছারি হইতে ফিরিয়া সে কথা শুনিলে বঙ্কিমবাবু হাসিতেন, বলিতেন বেশ বেশ, বাপের একটু আধটু শাসন করা ভাল !

আমার রাজকার্যে প্রবেশ করার কিছুদিন পর রাখালের ইচ্ছা হইয়াছিল ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড যান। আমি সে পরামর্শ অনুমোদন করিয়াছিলাম। অতি গোপনে পরামর্শ হইয়াছিল। আমি জানিতাম শেষে বঙ্কিমবাবু যাইতে দিবেন না। রাখালের শোক যে তাঁহাকে পাইতে হয় নাই ইহা এখন সান্ত্বনার কথা মনে হয়। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দুই তিনবার মাত্র রাখালের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। দৌহিত্রগণের প্রতি বঙ্কিমবাবুর স্নেহের কথা উঠিলে বলিয়াছিলেন সে স্নেহে তিনি পাগল ছিলেন। রাখালের মুখে যে আনন্দ দীপ্তি ছিল ইদানীং তাহা আর দেখিতাম না। আমার কাছে কিছুই তার গোপন ছিল না, বুঝিতে পারিতাম বঙ্কিমবাবুর শোক শেলের মত তার হৃদয়ে বিঁধিয়াছে। কিন্তু তখন জানিতাম না ইহ জীবনে সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

কৃষ্ণনগর রাজবাটির দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, সুলেখক বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মাঝে মাঝে স্বাধীনভাবে বঙ্কিমবাবুর লিপিপ্রণালী এবং উপন্যাসে চিত্রিত কোন কোন চরিত্রের সমালোচনা করিতেন। একদিন জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কথায় কথায় কার্তিকবাবুর সহিত তাঁর বন্ধুত্বের কথা উঠিল। হাসিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"সে কথাটা মনে রেখো হে, সে কথাটা মনে রেখো !"

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও কদিন আমার কথাপ্রসঙ্গে এ দেশে পোষ্যপুত্র-গ্রহণ প্রথার আলোচনা হইল। তাঁহার মতে পোষ্যপুত্র প্রায় ভাল হয় না। লোকে নাম রাখিবার জন্য পরের ছেলে গ্রহণ করে তার চেয়ে সৎকীর্তির কোন অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত নাম রক্ষা হইতে পারে। নিজের পুত্রের দ্বারা অনেকের মুখ অন্ধকার হইতে দেখা গিয়াছে পরের ছেলেত দূরের কথা।

শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম-বাবুর একবার পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। তাহাতে তিনি তন্ত্রের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একদিন সে কথা উঠিলে বলিলেন প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র বঙ্কিমের পড়া নাই। সিদ্ধ তান্ত্রিকেরা বলেন আসল তন্ত্রশাস্ত্র বঙ্গদেশে এখন আর চলিত নহে—সে আলোচনাই নাই।

পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে একদিন বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংস কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি আপনার বড় বিদ্যার অভিমান। বঙ্কিমবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ধর্মোপদেশ শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া সকল উড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের অতঃপর আর কখন দেখাশুনা হইয়াছিল কিনা আমি অবগত নহি।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় গেরুয়া বসন পরিধান তাঁর কোন পূর্ব পরিচিত একটি লোক আসিলেন। কথায় বুঝিলাম কার্যক্ষেত্রে পুরাতন পরিচয়। আগন্তুক নিজের কোন আত্মীয়ের জন্য সাহেব-সুবার কাছে একখানি অনুরোধ পত্রের প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমবাবু ঔদাস্য সহকারে অথচ মিষ্টভাবে বলিলেন, "ওসবে আমি আর নেই। তুমি গেরুয়া ধরেছ, মনে মনে আমারও তাই জেনো।"

সচরাচর কার্যক্ষেত্রে সিভিলিয়ানদের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বনিবনাও হইত না। বিশেষত Bransonism লেখার পর হইতে সাহেব মহলে তিনি কিছু অপ্রিয় ছিলেন। অনেক বিবেচনার পর আনন্দমঠ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক সাহেব তাঁহার গুণের মর্যাদা করিতেন। মাননীয় বোলটন সাহেবের সঙ্গে বহরমপুরে কার্যক্ষেত্রে তাঁহার যে ঘনিষ্টতা হয়, বরাবর তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্প্রতি পরলোকগত গৃম্‌লি সাহেব তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কথা কতবার আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন। সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্টেট হইলে বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নির্ভিকতার জন্য প্রথম প্রথম একবার মনোমালিন্যের কারণ হইয়াছিল। কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবুর কাজকর্ম দেখিয়া তিনি একেবারে খুসি হন। হাসিয়া বঙ্কিমবাবু আমায় বলিয়াছিলেন তোমার কথাই ঠিক; গৃমলি সাহেবের খুব মহৎ অন্তঃকরণ।

সুপণ্ডিত গৃয়ারসন সাহেব আমায় তুইবার বলিয়াছিলেন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "শকুন্তলা, মিরান্দা ও ডেসডিমোনা" শীর্ষক বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ যথার্থই বড় উপাদেয়। সেরূপ লেখা বেশি তিনি পড়েন নাই।

দেখিয়াছি শম্ভুবাবু লিখিতে বসিয়া বড় কাটকুট করিতেন। নব্য লেখকদিগকে তিনি বলিতেন নিজে লিখিয়া কাটিতে মনের খুব বলের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের সে সব ছিল না। প্রথমবারেই ক্ষিপ্রহস্তে অবিশ্রান্ত কাপি হাফ মার্জিনে তিনি লিখিয়া যাইতেন, পরে কিছুদিন ফেলিয়া রাখিয়া আবশ্যক বোধ করিলে চাই কি সমগ্র পরিচ্ছেদ বাদ দিয়া নূতন করিয়া আবার লিখিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতির অবসরে রাখালের সঙ্গে লুকাইয়া দেবী চৌধুরাণীর যে সম্পূর্ণ কাপি পাঠ করি, প্রকাশকালে তাহার বিস্তর বদলাইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদর্শন আমার হাতে আসিলে ঐ উপন্যাসের প্রুফ আমায় দেখিতে হইত। তিনি যেসব অংশ অবহেলায় কাটিয়া দিতেন, আমার তাহাতে বড় মায়া বোধ হইত। তাঁহার লেখনী কিরূপ দ্রুত চলিত তাহার একটি উদাহরণ মনে হইতেছে। বহুবাজারের মোড়ে সংস্থাপিত জনসন প্রেসে একদিন সঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তাঁহার টেবিলে "কমলাকান্তের জোবানবন্দী"র অসম্পূর্ণ কাপি দেখিলাম। পড়িতে পড়িতে আমায় হাসিতে দেখিয়া সঞ্জীববাবু বলিলেন—আমি এখনও পড়ি নাই, কি লিখেছে পড় তো। শুনিয়া তিনিও হাসিতে লাগিলেন এবং যেরূপে প্রবন্ধটির জন্ম হইল তাহার গল্প করিলেন। সেইদিন প্রত্যুষে বৃষ্টি হইতেছিল, সঞ্জীববাবু তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। বঙ্কিমবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মেজদাদা এখনও বিছানায় পড়ে কি ভাবছেন? বঙ্গদর্শনের একটা লেখার অভাব হওয়ায় সঞ্জীববাবু চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন—জল লিখি কি বাদল লিখি তাই ভাবছি। বঙ্কিমবাবু তখনই উপরে চলিয়া গেলেন এবং কাছারী গমনের পূর্বে কমলাকান্তের জোবানবন্দীর অর্ধেকের উপর সম্পূর্ণ হইল। পরদিন বাকি অংশ পড়িবার ঔৎসুক্যে শীঘ্র শীঘ্র বঙ্গদর্শন অফিসে গিয়া দেখি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে, অথচ কাটকুট নাই বলিলেও চলে।

উভয় ভ্রাতায় বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লিপিচাতুর্যের বড় প্রশংসা করিতেন। বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার বলিয়াছিলেন চন্দ্রশেখরবাবুর তু'একটি প্রবন্ধ পড়িয়া নিজের লেখা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।

ইদানীং বঙ্কিমচন্দ্র ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন, বেশ কোষ্ঠী দেখিতে শিখিয়াছিলেন। আমার কোষ্ঠী দেখিতে চাওয়ায় একদিন তাহা পকেটে লইয়া বাহির হইলাম। তখন রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়িয়া পদরত্নাবলী সংগ্রহ করিতেছিলাম, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বৈঠক হইত। আমার কোষ্ঠী দেখিয়া রবীন্দ্রবাবু নিজের সুবৃহৎ কোষ্ঠীখানি বাহির করিলেন, আমি সেখানিকেও হস্তগত করিয়া সন্ধ্যার পরই বঙ্কিমবাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। রবিবাবুর কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন, বারম্বার বলিয়াছিলেন যে তিনি "লগ্ন চাঁদা" এবং কোষ্ঠীর ফল অতি আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথকে কি অনন্যসাধারণ চক্ষে তিনি দেখিতেন, তাহা সেই দিন বিশেষভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। মনে হইতেছে আমার সেই ধারণার কথা পরদিন প্রিয়বন্ধু বাবু প্রিয়নাথ সেনকে না বলিয়া থাকিতে পারি নাই। তাঁহার নিজের ও সহধর্মিণীর কোষ্ঠী এবং ঠিকুজি মিলাইয়া বঙ্কিমবাবু আমায় বুঝাইলেন তাঁহাদের জীবনের অনেক কথা ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল। আমার কোষ্ঠি প্রকাশ করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দুই একটি পরে ঘটিয়া গিয়াছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বেলা সাড়ে দশটার আমলে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রুশিয়ার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর বনরফ বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত এবং বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি কলুটোলায় তাঁহার বাসায় সমবেত হন। প্রবীণ প্রফেসর নববিজিত বর্মা মুলুক সম্প্রতি ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন সে দেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষার কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কি না? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহা ব্রহ্ম-বিজয়ের অনুকূল নহে, কিন্তু কোন পুস্তিকা (pamphlet) কেহ লেখে নাই। প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে ইহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারও সাহস হয় না। তখন দেশ ভ্রমণের কথা উঠিল। রমেশচন্দ্র আবু পর্বতের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করিলেন। বঙ্কিমবাবু প্রফেসরকে সুধাইলেন ব্রহ্মদেশের স্থাপত্য (architecture) কেমন দেখিলেন, অধ্যাপক বনরফ ব্রহ্ম-স্থাপত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—কিন্তু সবই কাষ্ঠনির্মিত। সেখানকার রাজার পুস্তকালয় এই

পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। খুব প্রকাণ্ড লাইব্রেরী তবে একই পুস্তকের বিস্তর সংখ্যা। প্রফেসর বনরফের বিনয় এবং সৌজন্যে সকলেই সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে পথে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন একসঙ্গে এতগুলি লোকের সহিত আলাপ, ইতিপূর্বে আর কখন তিনি করেন নাই। এই সম্মিলন দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের আড়ম্বরশূন্যতা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম বেশভূষায় কোন পারিপাট্য করেন নাই। বাটিতে যে সাধাসিধে ধুতি এবং হাতকাটা জামা তাঁহার নিত্য পরিধেয় ছিল, তাহার কোন পরিবর্তন দেখিলাম না। ইহার পর মহাসমাদরে বঙ্কিমবাবু বন্ধুগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রীতিভোজে তিনি অতিশয় আমোদ অনুভব করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বিজয়লাল দত্ত

যে অসাধারণ প্রতিভার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশে শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না। তিনি নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁঠালপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহার পিতা বঙ্গদেশের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন।

সুকবি Wordsworth যথার্থই বলিয়াছেন—"Child is father of the man." বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একথা সর্বথা সত্য। তিনি শৈশবে যে অতুল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, জীবনের পরিণত অবস্থায় তাহা পূর্ণ বিকশিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। জীবনের প্রভাত সময়ে তিনি তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে তাঁহার ভবিষ্য মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, জীবনের মধ্যহ্নকালে তাহা পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি একদিনেই সমস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ণমালা শিক্ষার পর তিনি কিছু দিন পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। অসাধারণ স্মরণ-শক্তি ও অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি গুরুমহাশয়ের গভীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহাব পিতা ইংরাজী শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মেদিনীপুর লইয়া যাইয়া তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় যেরূপ উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছয়মাস অন্তর একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বৎসরে দুই শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করিতেন, এবং পরীক্ষার সময় প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক সকলের ভালবাসা ও সমাদরের পাত্র হইতেন।

তাঁহার ত্রয়োদশ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা ২৪ পরগনায় নিয়োজিত হইলেন ; সুতরাং তাঁহাকেও পিতার সহিত মেদিনীপুর ছাড়িয়া আসিতে হইল। এই সময় তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকে তাঁহার

জ্ঞান-পিপাসা মিটিত না—তিনি পাঠ্য-পুস্তক ছাড়িয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পুস্তকালয় হইতে রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। ইহাতে তাঁহ বার্ষিক পরীক্ষাদানের কোন ব্যাঘাত বা ক্ষতি জন্মিত না—প্রতি বৎসর পরীক্ষাে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ও বহুবিধ মূল্যবান পুরস্কার লাভ করিতেন। হুগলী কলেজ হইতেই তিনি যথা সময়ে বিশেষ দক্ষতার সহিত সিনিয়ার স্কলারশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি কাঁটালপাড়া কোন কৃতবিদ্য অধ্যাপকের নিকট চারি বৎসর কাল যত্ন-সহকারে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

হুগলী কলেজের পাঠ শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র আইন শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৮ সালে বি, এ, পরীক্ষার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তিনি আইন পাঠ বন্ধ রাখিয়া উক্ত পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং অল্প কালের মধ্যেই উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম বি, এ, উপাধিধারী। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি গণিত, কি বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন গুণগ্রাহী লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটে পদে নিযুক্ত করিলেন। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি এই অযাচিত রাজ সম্মান গ্রহণ পূর্ব্বক যশোহর গমন করিলেন। প্রায় ৫।৬ মাসের মধ্যেই তাঁহা কার্য ও বিচার-দক্ষতার প্রশংসা শুনা যাইতে লাগিল। এইস্থানে অবস্থা কালেই ইনি তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত সুলেখক দীনবন্ধু মিত্রের সহিত সুদৃঢ়বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। যখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পাঠ করিতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" নামক সংবাদপত্রে দীনবন্ধুর বিদ্যাবুদ্ধির প্রথম পরিচয় পান উক্ত সংবাদ পত্রে দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকনাথ অধিকারী বিবিধ বিষয়ে কবিত লিখিতেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের জন্য উহাতে কবিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন।

সাত মাস কাল যশোহরে অবস্থিতির পর তিনি কাঁথি মহকুমার কার্যভার প্রাপ্ত হন। একবৎসর কাল দক্ষতার সহিত তথায় বিচার ও শাসন কার্য সম্পাদন করিয়া খুলনায় প্রেরিত হইলেন। এই সময় দুর্দ্দান্ত নীলকরগণের অত্যাচারে তত্রত্য দরিদ্র প্রজাবর্গ একান্ত উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। প্রবল নীল

করদিগের ভীষণ উৎপীড়ন ও অসহায় দুর্বল প্রজাবর্গের দুর্গতি ও কাতর ক্রন্দন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইল। যে হতভাগ্য উৎপীড়িত প্রজাবর্গের দুরবস্থা ও সকাতর ক্রন্দনে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ সহৃদয় দীনবন্ধু নীলকরগণের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য "নীলদর্পণ" রূপ অমোঘ অস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিও খুলনায় স্বচক্ষে তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া অবিলম্বে নির্জনে দীনবন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া নীলকর অত্যাচার দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিলেন।

এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম বদ্ধ মূল হইতে লাগিল—এই সময় হইতেই তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, স্বাধীনতা প্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগের পরিচয় প্রদানে কি বিদেশীয়, কি স্বদেশীয়, সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সাহিত্য জগতে যে নতুন প্রতিভার পরিচয় দানে অমরতা লাভ করিয়াছিলেন, খুলনায় অবস্থিতিকালেই তাহার প্রথম বিকাশ। এই সময় কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত "Indian field" নামক পত্রিকার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে প্রথমতঃ "Rajmohan's wife" নামক একটি উপন্যাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল—ইচ্ছা করিলে তিনি উপন্যাস-খানি শেষ করিয়া ইংরাজী ভাষায় আরও অনেকগুলি উপন্যাস ও বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া ইংরাজী ভাষায় সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, সর্বাঙ্গ সুন্দর সমুজ্জল-রত্ন-রাজি সুশোভিত ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডারের অঙ্গ পুষ্টি সাধন ও শোভা সম্বর্ধনে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস বঙ্গীয় লেখকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র শুভক্ষণে ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনার ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক বিপুল উৎসাহ ও নতুন আনন্দের সহিত মাতৃভাষার পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রদর্শিত উজ্জল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক তিনি সংস্কৃতানুসারিনী দুর্বোধভাষা সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় পরিণত এবং উহাতে হৃদয়ের বিবিধ ভাব-নিচয় সহজে সুন্দররূপে বিকশিত করিবার উপযোগী উপকরণ লইয়া "দুর্গেশ নন্দিনী" রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যে সময় মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ণের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত ভাষার যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত "বাঙ্গালাসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক স্কটের "Ivanhoe" গ্রন্থের ছায়ামাত্র অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশ নন্দিনী" উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নূতন ভাব ও নূতন কল্পনা ও মাধুর্যের একত্র সমাবেশে বঙ্গ ভাষাকে প্রথমতঃ কতকগুলি কুসংস্কার ও কুপ্রথার নিগড় হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। খুলনা হইতে বারুইপুরে প্রেরিত হইবার অল্পকাল পরেই এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অমনি চারিদ্দিকের পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে গ্রন্থকর্তার প্রতি সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সকল সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণের অগ্রণী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রতি সমধিক নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত আক্রমণ সহ্য করিতে লাগিলেন, এবং সমালোচনা স্রোত মন্দীভূত হইতে না হইতেই নব তেজ নব উৎসাহ ও নব অধ্যবসায় সহকারে সুচারু আভরণে নূতন নূতন গ্রন্থ রচনায় বঙ্গভাষার শোভা সম্পাদন ও সম্পদ বর্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। বারুইপুরে অবস্থানকালে "কপালকুণ্ডলা "ও" মৃণালিনী" নামক দুইখানি উপন্যাস প্রকাশ করিলেন।

বহরমপুর অবস্থান কালে, ১২৭৯ সালে তিনি "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই বঙ্গদর্শন হইতে তাঁহার প্রতিপত্তি ও গৌরব দেশ দেশান্তরে পরিব্যপ্ত হইল। বঙ্গদর্শন চারি বৎসর কাল নিয়মিত রূপে তৎকর্তৃক পরিচালিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি-পথে এক নূতন যুগ আনয়ন ও মহা-বিপ্লব সাধন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উহার পত্রে পত্রে কত প্রাণ কত আলোক, কত তেজ, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা, কত মধু ও কত মদিরা ঢালিয়া দিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির স্রোত পূর্ণ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন। তিনি একদিকে নির্মাণ ও অপর দিকে সংস্কার ও উচ্ছেদ সাধনে বঙ্গ ভাষার উন্নতির স্রোত বেগে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অদূরদর্শী ও চিন্তা-শক্তি-বিহীন লেখকগণের যথেচ্ছাচারে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পথে যে সকল জঞ্জাল ও আবর্জনা জন্মিয়াছিল, তাঁহার কঠোর অনুশাসনে তৎসমস্ত ছিন্ন ও ইতস্ততঃ অনাদরে বিক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত পথ পরিমার্জিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের সমুজ্জল দৃষ্টান্তানুসরণে দিন দিন কত পুস্তক, কত পত্রিকা, ও কত প্রবন্ধ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে লাগিল।

নানা কার্যে ঘোরতর পরিশ্রম বশতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে ১২৮২

সালের শেষ ভাগে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্যভার পরিত্যাগ করিলেন। যতদিন বাঙ্গালি জাতি ও বাঙ্গালী ভাষা জগতে বিদ্যমান রহিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে জগতের বিশাল স্মৃতি-ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিবে।

১২৮৩ সালে তাঁহার সুযোগ্য মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পুনঃ সম্পাদন ভার লইলেন। তৎকর্তৃক পরিচালিত হইয়া বঙ্গদর্শন আরও কয়েক বৎসর সগৌরবে স্বকর্তব্য সাধনে ব্রতী হইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও উহাতে বিবিধ উপন্যাস ও প্রবন্ধের অবতারণায় বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচর্যায় বিরত হন নাই।

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" "কৃষ্ণকান্তের উইল", "দেবী চৌধুরাণী," "আনন্দমঠ", "সীতারাম", "ইন্দিরা", "কমলাকান্তের দপ্তর", "বিজ্ঞান রহস্য", ও "সাম্য", প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় দিন দিন বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছিল। তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় তাঁহার তেজস্বিনী ও উদ্দাম ভাব-তরঙ্গ সুসংযত করিয়া জগতের কল্যাণকর অভিনব ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্গ সাহিত্যের নব জীবন বিধান ও নব শোভা সম্বর্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বে তিনি সরলান্তঃকরণে সহজ প্রণালীতে যে সকল কুসংস্কার বর্জ্জিত গভীর ধর্ম মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় বিস্ময় জনক। তিনি হিন্দুর গৃহ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব ও মহত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যেরূপ ধীর ও সংযত-ভাবে সৎসাহস, সুন্দর যুক্তি, পরিমার্জ্জিত বিচার-শক্তি গভীর অনুসন্ধিৎসা ও কঠোর সত্যানুরাগের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরও হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপার বিস্ময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অল্প দিন হইল তিনি হিন্দুর অমূল্য ধর্ম গ্রন্থ গীতার বিশদ ব্যাখ্যা ও বেদের বিশুদ্ধ ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমির ঘোর দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দুইটি অবলম্বিত বিষয় পরিসমাপ্ত হইবার পূর্বেই নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে অনন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করিল! এই দুইটি মহৎ বিষয় সংসাধিত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ ও বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত।

লেখক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বঙ্কিমটি সকলের পরিচিত নহেন। তাঁর হৃদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। মাতাপিতার প্রতি

প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগ তাঁহার হৃদয়ের উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। তোষামোদ ও অযথা স্তুতিবাদে রাজ পুরুষগণের মনোরঞ্জনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘৃণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, এজন্য তিনি দুই একবার দুই একজন উদ্ধত-স্বভাব দাম্ভিক রাজকর্মচারীর একান্ত অপ্রিয় ভাজন হইয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার স্বাধীনতা ও সত্যানুরাগ খর্ব হয় নাই। ন্যায়-বিচার ও কার্য বিচক্ষণতা প্রভাবে তিনি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সমান ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন।

তিনি চিরদিন নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে উদার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিতেন। একবৎসর গত হইল শোভাবাজারের সুশিক্ষিত ও সহৃদয় কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি হৃদয়গ্রাহী যুক্তির সহিত হিন্দুর সমুদ্র-গমন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার উন্নত হৃদয় কুসংস্কার হইতে অতি দূরে অবস্থিতি করিত।

বন্ধুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল। কয়জন লোক তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রতি সমাদর ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে জানেন? যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি একবার তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন তিনি চিরদিন তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম ও প্রীতি উপভোগ করিয়াছেন। দীনবন্ধুর প্রতি তাঁহার কিরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল যাঁহারা দীনবন্ধুর জীবন চরিত ও আনন্দ-মঠের উৎসর্গ পত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া এখনও স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণার্থে নিযুক্ত আছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের অকাল অস্তগমনে আজি তাঁহাদের হৃদয় একান্ত শোকাকুল হইয়াছে উঠিয়াছে।

অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। একদিন কোন একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমি তাঁহার শিষ্টাচার ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল আশ্বিন মাসে বিজয়

দশমীর পরে একদিন আমি তাঁহার কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি একখানি সোফায় বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহার চরণ তলে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলে তিনি শিষ্টাচার বশতঃ তদীয় চরণ যুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বলিলেন "পদধূলি পাইবে না"। তখন আমি তাঁহাকে বিনম্রভাবে বলিলাম, "আমি হিন্দুর সন্তান—হিন্দুর প্রথানুসারে আপনাকে বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি—পদধূলী গ্রহণে আমার বিশেষ প্রয়োজন।" তিনি হাসিমাখা মুখে বলিলেন, "প্রণাম করিয়াছ, তাহাতেই আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি—পদধূলি পাইবেনা—বিশেষ আত্মীয় ও গুরুজন ভিন্ন যার তার পদধূলি গ্রহণ ভাল নয়।" আমি বলিলাম, "সত্যই কি আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার অধিকার নাই?—বিদ্যালয়ে আপনার নিকট শিক্ষালাভ করি নাই সত্য, কিন্তু গৃহে বসিয়া আপনার পুস্তক-রাশি হইতে যে অপূর্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। আপনার বঙ্গদর্শন যৎকালে প্রকাশিত হয় তখন আমি ক্ষুদ্র বালক তখন উহার প্রকৃত কর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতাম না, কিন্তু পরে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে কত গভীর তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আপনার "চন্দ্রশেখর" ও "প্রতাপ" আমার নিকট দেবতার ন্যায় আরাধ্য। আপনার "আনন্দমঠ" হইতে গভীর স্বদেশভক্তি ও স্বদেশের প্রতি সন্তানের কর্তব্য শিক্ষা পাইয়াছি। অতএব আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে যদি আপনি আমাকে উহা গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কাজে কাজেই আমি নিরস্ত হইব।" এই কথা বলিবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত চরণদ্বয়ের বস্ত্র উন্মোচন পূর্বক বলিলেন,—"এই লও! এতক্ষণ পায়ে মোজা আঁটা ছিল, এই মাত্র উহা খুলিয়া ফেলিয়াছি! মোজা আঁটা পরিষ্কার পায়ে একবিন্দু ও ধূলি পাইবে না।" আমি আপন মনে আমার বাসনা পূর্ণ করিলাম। তিনি দুই বাহু প্রসারণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা তোমার মাথায় এক বিন্দুও লাগে নাই কিন্তু সত্য সত্যই আর কোথা হইতে মস্তকে ধূলা লাগিয়াছে, আমি তাহা ঝাড়িয়া দিতেছি," —এই বলিয়া তিনি গভীর স্নেহের সহিত আমার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রায় ৫ মিনিট কাল ঐরূপ অবস্থায় আমি তাঁহার আলিঙ্গন মধ্যে আবদ্ধ রহিলাম।

যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহ আমার স্মৃতি-পথে দেদীপ্যমান রহিবে।

আমরা উভয়ে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি আজ কেবল বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছ অথবা আরও কিছু প্রয়োজন আছে?" আমি বলিলাম, "আমার আর একটি বিনীত প্রার্থনা আছে।" "আমি স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবন চরিত্র লিখিবার জন্য কতিপয় মাননীয় আত্মীয় বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আপনার মুখে আমি অনেকবার উক্ত মহাত্মার প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি—আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমার কার্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে ওই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল আমি তাহা অবশ্য করিব।" আমি বলিলাম, "আপনাকে প্রস্তাবিত পুস্তকের আদ্যোপান্ত যত্নের সহিত দেখিয়া সংশোধন ও পরিবর্তনাদি করিয়া দিতে হইবে এবং পুস্তকখানির জন্য একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিতে হইবে।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত এই ভার লইতে প্রস্তুত আছি—আমি পুস্তকখানি যত্নের সহিত দেখিয়া দিব এবং উহাতে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিব।" এই বলিয়া তিনি আমার যথেষ্ট উৎসাহ বর্ধন ও প্যারীচাঁদের কতই গুণকীর্তন করিলেন। এই দিন তিনি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে প্যারীচাঁদ মিত্রই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্বক উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক সুলেখক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি অকপটে প্যারীচাঁদের গুণবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই দিন হইতে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালরূপে চিনিলাম—এই দিন হইতে আমি তাঁহার প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিখিলাম।

তিন বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য পরিত্যাগ করিলে একদিন আমি কোন প্রয়োজন উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেই সময় দেশীয় সংবাদপত্রে কোন একটি রাজনৈতিক বিষয়ের ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার সহিত উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ করিলেন। প্রতি কথায় আমি তাঁহার গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া

বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "ভারত-বাসীর দুঃখ ও অভাবে প্রকৃত রূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, এরূপ ইংরেজ এদেশে অল্পই আছেন—যাঁহারা সেরূপ উদার প্রকৃতির লোক তাঁহারা ক্ষণজন্মা।" এই বলিয়া তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত রেণল্ড্‌স্‌ সাহেবের কোন কোন গুণের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই লোকটি যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পায় নাই। এদেশ ছাড়িয়া গেলে পর অনেকে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছে—এখন অনেকেই তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতেছেন। আমাদের কন্‌গ্রেসের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। যখন আমি তাঁহার মুখে "আমাদের কন্‌গ্রেস্‌" এই কথা শুনিলাম, তখন মনে বড়ই আনন্দ জন্মিল। তাহার কথা শেষ হইলে আমি সুযোগ পাইয়া বলিলাম—"আপনি এক্ষণে রাজকার্য হইতে অবসর পাইয়াছেন—এখন যদি আপনি কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন তাহা হইলে উহার বিশেষ হিত সাধিত হইতে পারে, আপনি কি উহাতে যোগদান করিবেন না ?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপাততঃ নয়।" আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন দিবেন না ?" তিনি বলিলেন, "তুমি একজন কন্‌গ্রেসের চেলা, সুতরাং উহার বিশেষ পক্ষপাতী—আমি কি জন্য উহাতে এখন যোগ দিতে পারি না, তাহা বলিলে তুমি হয়ত ব্যথিত হইবে, এজন্য উহা না বলাই ভাল—তবে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে আমি কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ বা উহার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নহি।" কন্‌গ্রেসে তাঁহার যোগদান না করিবার কারণ জানিবার জন্য আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে তিনি বলিলেন,—"কন্‌গ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই—দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে এবং অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। দেশের সাধারণ জন সমষ্টিকে মন্ত্রণা-গৃহ হইতে

দূরে রাখিয়া বৎসরান্তে একবার ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে প্রমত্ত হইলে তাহাতে দেশ জাগিবে না যতদিন দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোকদিগের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইবে, যতদিন তাহারা তাহাদের প্রকৃত অভাব ও স্বদেশের প্রতি তাহাদের কঠোর কর্তব্য বুঝিতে সক্ষম না হইবে, যতদিন ধর্ম-নীতি ও সমাজনীতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলভিত্তি না হইবে, ততদিন কেবলমাত্র নীরস রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহার গৃহে চির অন্ধকার, দুর্নীতি স্রোতে যাহার সমস্ত অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে, কেবল রাজনীতির আলোচনায় তাহার কি স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে? আমার বিবেচনায় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলন সমস্ত দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত। সর্বাগ্রে সকলের অধিক পরিমাণে সরলতা ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমি নানাচিন্তা ও নানা আন্দোলনের পর এক্ষণে ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব ও উন্নতি সাধিত হয় না—একমাত্র ধর্মানুরাগই জাতিমাত্রকে প্রভূত বলশালী ও গৌরবান্বিত করিতে পারে। এই জন্যই সর্বাগ্রে আমাদিগকে সৎ ও ধার্মিক হইতে হইবে, অন্যথা কোন আন্দোলন সুফল প্রদান করিবে না।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধীরভাবে তাঁহার জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, তিনি যথার্থই বিদেশীয় কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন—

> **"Religion comes from God's right hand,**
> **And needs a godly train,**
> **For tis righteousness that makes our land,**
> **A nation once again."**

কন্‌গ্রেসের পৃষ্ঠপোষক অনেকেই হয়ত বঙ্কিমবাবুর এই উক্তি পাঠে স্তম্ভিত হইবেন—অনেকে হয়ত মনে মনে তাঁহার প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু আমাদের আশা আছে যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় দুর্বলতা ও অসারতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য স্বজাতীয় কলঙ্কের কথা ভাবিয়া ধীরে ধীরে এক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক হৃদয়ের ভার লঘু করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ ছিলেন না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কন্‌গ্রেস সৃষ্টির বহুদিন পূর্বে তিনি তৎপ্রণীত আনন্দমঠ নামক গ্রন্থে অপূর্ব সন্তানদলের সৃষ্টি ও মাতৃপূজার বিরাট আয়োজনে "বন্দেমাতরং" এই অমৃতময় সঞ্জীবনী উদ্বোধন মন্ত্রে কোটি কোটি সন্তানের নিদ্রামগ্ন হৃদয়ের কিরূপ অত্যুগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, কন্‌গ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে গভর্ণমেণ্ট C. I. E. উপাধিদানে বঙ্গসাহিত্য সেবকবৃন্দের সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ কার্যদক্ষ ডেপুটি বলিয়া জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নাই—তিনি মৃতবৎ বঙ্গসাহিত্যের প্রাণদাতা ও উন্নতি বিধাতা বলিয়াই লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট সুপরিচিত—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অতুল প্রতিপত্তিই তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন ইংরাজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসরের ৫ই অক্টোবরের সাইক্লোনে (cyclonc) ডায়মণ্ডহারবার, কুল্পি, মুড়াগাছা, টেঙ্গরা-বিচি করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মণিরহাট প্রভৃতি গ্রাম ঝড়ে ও জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে ঝড়ে এ দেশের অধিকাংশ বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়, পরে কয়েকটি সমুদ্র তরঙ্গ বঙ্গোপসাগর হইতে বাত্যা-তাড়িত হইয়া আসিয়া সাগর-কূলবর্তী দক্ষিণ প্রান্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দৈব দুর্ঘটনায় প্রদেশস্থ বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিত-হৃদয়, কয়েকজন ধনশালী পার্সী ও কতিপয় গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্মচারী ও এ-প্রদেশস্থ জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্যদান করিয়া সত্বরই একটি প্রচুর ধন ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ২৪ পরগনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েক থান পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত সঙ্গে আমাকে লোকের দুর্ভিক্ষ ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলি নদীর) পার্শ্ববর্তী টেঙ্গরাবিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। দ্রব্যজাত রক্ষার জন্য আমার সঙ্গে একজন বন্দুকধারী পুলিস কন্‌ষ্টেবলও প্রেরিত হয়। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে বহু সংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে এবং পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যে ও বনে জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি ও ভূমিপতনেও ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, দেখিলাম। আমি যৎপরোনাস্তি কষ্টে সেই শবরাশি ও তন্নিঃসৃত পূতি-গন্ধ দূষিত বায়ুরাশি ভেদ করিয়া সমস্ত দিবা রাত্রির পর গন্তব্য স্থান গঙ্গাধরপুরে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৭।৮টা আমি সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র ২।৩ শত অন্নবস্ত্র ক্লিষ্ট লোক আমার দ্রব্য

জাত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আসিল। এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমি তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি, বণ্টনান্তেই চলিয়া যাইব, একথায় তাহারা প্রবোধিত ও স্থির হইতে পারিল না। আমি তখন পুলিশের বন্দুকটি লইয়া একটি ডোঙ্গার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, "যে কেহ আমার ডোঙ্গা স্পর্শ করিতে সাহস করিবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ লইব।" ইহাতে তাহারা কিছু ভীত হইয়া অগত্যা আমার বণ্টন প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মত প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন করিয়া দিয়া মজিলপুরে ফিরিয়া আসিলাম এবং বঙ্কিম বাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম এবং তাঁহাকে দ্রব্যাদির হিসাব দিলাম। তিনি আমার কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষ কার্যের আধিক্য প্রযুক্ত ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার ভার অল্পদিনের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং ডায়মণ্ড হারবার হইতে বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এবং দুর্ভিক্ষ কার্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষ কার্যে বঙ্কিম বাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম, হেমবাবুকেও সেইরূপ করিতে লাগিলাম। সাইক্লোন প্রযুক্ত কেবল এই দুই মহকুমাই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়ছিল।

এ সময় ১৮৬৪ সালের নূতন রেজিষ্টরি আইন অনুসারে মহকুমায় মহকুমায় নূতন রেজিষ্টরি অফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার নূতন রেজিষ্ট্রেসন আফিসের হেড ক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে কর্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্রচিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার লিখিত রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম এবং সমস্তগুলিই পড়িতাম।

এই সময়ের পূর্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে ছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার Study room এ—প্রস্থান

করিতেন এবং চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীর লেখা সমাপ্ত প্রায় হইলে, কিম্বা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে আমি তাঁহার পাঠ-কক্ষের টেবিলে কয়েক ভলুম স্কটের ওয়েবর্লী উপন্যাস সজ্জিত দেখি। তিনি হয়ত কোন বন্ধুকে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন ; বন্ধু তাঁহাকে Ivan Hoe-র উপাখ্যান ভাগের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান ভাগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, বলিয়া থাকিবেন, তাহাতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবত নূতন ওয়েবর্লী উপন্যাসাবলী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দেখিতে আনিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইবার পূর্বে তিনি "Ivan Hoe" পড়িয়াছিলেন কি না তাহা আমি ঠিক বলিবার অধিকারী নহি। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্যের অনুরোধে অবিকল প্রকাশ করিয়া দিলাম। আমি আগে দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করি, তাহার অনেক দিন পরে Ivan Hoe অধ্যয়ন করি। বলিতে কি আমি উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। আমি যীহুদা রমণীর (Rebeca) চিত্র পাঠ করিবার সময় আয়েসাকে একটি মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারি নাই। অন্যান্য পাঠকেরাও দুর্গেশনন্দিনীর চিত্রাবলীকে Ivan Hoe-র ছায়া বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। Ivan Hoe-র ছায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজ মুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না আমি বঙ্কিমবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণাকে অপসৃত করিয়াছি। কেন না আমি তাঁহার Honesty কে unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহাহউক দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা যে সম্পূর্ণ একটি অভিনব সৃষ্টি ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী মুদ্রিত হইয়া আসিলে তিনি আমাকে এক খণ্ড পড়িতে দিলেন। পাঠান্তে পুস্তক সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান ভাগের খুব প্রশংসা করিলাম এবং লেখার সম্বন্ধে বলিলাম পুস্তকের বাঙ্গালা ইংরাজীর অনুবাদের ন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তখন আমার মন্তব্যে তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে "আমার লেখা আজও রীতিমত বাঙ্গালা হয় নাই। আজও দেখিতে পাই স্থানে স্থানে যেন ইংরাজীর অনুবাদ করিয়াছি"। তিনি আরও বলিলেন যে তখনকার প্রায়

সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালার এই দোষ। তিনি এই দোষ কেবল শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় খুব কম দেখিতে পান। নগেন্দ্রনাথ বাবু কখনও কখনও বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। ইহাতে তাঁহার লেখার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর পরিচয় হয়। বঙ্কিমবাবু নগেন্দ্রবাবুর কোন গ্রন্থ কখনও পাঠ করেন নাই।

আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিম-বাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন কিম্বা সে সময় আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোন পুস্তক বিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম তিনি শ্রবণ করিতেন এবং স্থান বিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭॥ হইতে ১১॥ পর্যন্ত তাঁহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই "Light reading" ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে, তাহাতে "Progressive development of species" বিষয়ে লেখা ছিল। তিনি অধ্যয়নে সমর্থ থাকিলে কদাপি আমার এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।

এ সময় বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগর নিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটিতে আসিয়া বাস বরিতে লাগিলেন এবং সেখানে থাকিয়া অল্প-স্বল্প চিকিৎসা ব্যবসায়ও চালাইতেন। মহেশবাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র। তিনি ছাত্রাবস্থায় যে খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তাদৃশ বিখ্যাত ডাক্তার হইতে সক্ষম হন নাই। তিনি কোন এক বৎসর কলেজের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অনুবীক্ষণ যন্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশবাবুর আলাপ হওয়াতে মহেশবাবু সেই অণুবীক্ষণটি দিন-কতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই অনুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম-ভাগ, এবং জীব শোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্য সঙ্গী থাকিতাম। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিতেন "জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত আর সমস্তই সুন্দর"। এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও

তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই—কখনও ঈশ্বরের নাম শুনি নাই বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন পরিচয় কখনও পাই নাই। কিন্তু আমার অনুমান হয় এই সকল অণু-প্রমাণ সৃষ্টির অপরূপ শোভাসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ গোচর করিবার সময় তাঁহার ভাবপ্রবণ অন্তরে বৈজ্ঞানিক জাতীয় এক প্রকার ঈশ্বর ভক্তির বীজ নিপতিত বা রোপিত হয় যাহা তাঁহার প্রবীণ বয়সে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া কথঞ্চিত সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বারুইপুরে অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণবাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোন অভিমান দেখি নাই। বঙ্কিমবাবুতেও কনিষ্ঠত্বের কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা শরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কোন বিষয়ে গোপনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না।

ইহার অনেক দিন পুর্বে তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে "Rent Law" সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। লোকের মুখে শুনিতাম এখানি বঙ্কিমবাবুরই রচিত। বঙ্কিমবাবু এই পুস্তিকার প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। একবার হাইকোর্টের বিচারপতিদের "Rent Law" (১৮৫৯ সালের ১০ আইন) সম্বন্ধে প্রত্যেকের সুবিস্তীর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে বাহির হয়। সেই মন্তব্য মধ্যে স্থানে স্থানে সঞ্জীববাবুর Rent Law সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত অংশ ছিল। বঙ্কিমবাবু হাইকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য পুস্তিকা প্রাপ্তি মাত্রেই, তন্মধ্য হইতে সঞ্জীব বাবুর পুস্তিকার উদ্ধৃত অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং আমাকে দেখাইলেন। এই যত্ন অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ হইতেও বিকাশিত হইতে পারে।

মধ্যে মধ্যে কবিবর বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগনার Assistant District Superintendent বাবু জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলে কয়েকদিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন। ইহারা উভয়েই গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী এবং ছুটীর সময় ভিন্ন প্রায়ই অপর সময়ে আসিতেন না।

দীনবন্ধু বাবু বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা ২।৪ বৎসরের প্রবীণ হইবেন এবং জগদীশবাবু তাহা অপেক্ষা আরও ১২।১৪ বৎসরের প্রবীণবয়স্ক। একবার বঙ্কিমবাবুর মজিলপুরে অবস্থিতিকালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি ৮।৮॥টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের আগমনের কোন সংবাদ পাইয়াছিলেন কিনা জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্কিমবাবু যাহাতে তাঁহাদের গাড়ীর শব্দ শুনিতে না পান, এমন স্থানে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন, "আমরা বাগ্‌বাজারের মেথ্‌রাণী।" বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কালুয়া নিকাল দেও", "কালুয়া নিকাল দেও"। এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিয়োডোর পার্কারের "Ten Sermons" নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "Such worst English I have never read." আমি পার্কারের লেখার ও ইংরাজির খুব ভক্ত ছিলাম। তাঁহার হেয়জ্ঞান সূচক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।

এসময় বঙ্কিমবাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিলপুরে আসিতেন তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সে সময় ৺হরমোহন দত্তের ইষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্বয় ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশ্যনে বাস করিতেছিলেন।

এই সময়ের কিছুদিন পরে আমি বারুইপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। বঙ্কিমবাবু ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেবের নিকট আমার অনেক প্রশংসা করেন তাহাতে বেনব্রিজ সাহেব আমাকে বারাসত সবডিভিজন্যাল হেড ক্লার্ক পদে মনোনীত করিয়া পাঠান। ইহার পর বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার অল্পই দেখা সাক্ষাৎ হইত।

বঙ্কিমবাবুর বারুইপুরে অবস্থানকালে একটী দুর্ঘটনা হয়। তাহা অগ্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অন্য বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর কার্যতৎপরতা ও পরহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদিন মধ্যাহ্নকালে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যেই থামিয়া গেল।. কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪।৫ মিনিট পর একটি লোক দৌড়াইয়া আসিয়া কাছারীতে সংবাদ দিল, "রাজকুমারবাবুর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ুঃ হইয়াছে। শুনিবা মাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারির সমস্ত কার্য ফেলিয়া রাজকুমার বাবুর বাটির দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাহার অনুগমন করিলাম। (এই রাজকুমারবাবু বারুইপুরের জমিদার রাজকুমার চৌধুরী। তাঁহার বাটী ফৌজদারী নূতন কাছারির ৫।৬ রশি তফাতে)। আমরা বজ্রাহত বাটীতে গিয়া দেখিলাম যে বজ্রটী গৃহ সংস্কারে ব্যবহৃত একটি বাঁশের উপরেই নিপতিত হয় বাঁশটী বজ্রাঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে বিদ্যুদাগ্নি আহত বাঁশটাকে পরিত্যাগ করিয়া সংলগ্ন দ্বিতল বাটীর উপরের ছাদের আলিশা আশ্রয়. করিয়া তাহা হইতে কিছু দূরে আসিয়া ঘরের দেউল অবলম্বনে নীচের তলার একটি ঘরে নামিয়া আসে। নামিবার সময় দেউলের বালিখাম চুনখাম অঙ্গুলি প্রমাণ পরিসরে উপর হইতে বরাবর সোজা খসিয়া পড়িয়াছে। নীচের ঘরে তিনটি লোক একটি মাদুরে দেওয়াল ঠেসিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল, সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ২১ বৎসর হইবে। দ্বিতীয় বজ্রাহতটি রাজকুমার বাবুর সম্পর্কে ভাগিনেয়। এই যুবাটি তখন সেই মাদুরের উপরে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল। তৃতীয় বজ্রাহতটি বাবুর তৃতীয় পুত্র। ইনি তখন অনুমান ষোল বৎসর বয়স্কের ন্যূন হইবেন। ইনি সচেতন অবস্থায় এদিক ওদিক করিতেছিলেন। ইঁহার অঙ্গের উরুদেশে একটি ছড় দেখিলাম, ইনি তখনও তাহার জ্বালা অনুভব করিতে-ছিলেন। ছড়টি উরুদেশের ঊর্ধ্বস্থান হইতে পাদমূল পর্যন্ত নামিয়াছে। রাজকুমার বাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বকীয় অঙ্গে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমার বাবু সেদিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। মৃত পুত্রটির মাতা, পুত্রাঙ্গে কোন বজ্রচিহ্ন না দেখিয়া হয়ত মনে করিতেছিলেন পুত্রটি স্তব্ধ অচেতন মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। মৃতের অঙ্গে বস্তুতঃ কোন চিহ্ন ছিল না। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কোন স্থান দগ্ধ হয় নাই। কোমরের ঘুন্সীটি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে, ঘুন্সীতে চাবিটিও যেমনি ছিল তেমনি আছে। বঙ্কিমবাবু চাবিটি গলিয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছিলেন; বজ্রপাত কালে আহতের মস্তক পতন-চিহ্নিত স্থান হইতে এক

বিগতের কিছু বেশী দূরস্থ ছিল। আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া রাজকুমার বাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবাটির চৈতন্যোদয় জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার মহোদয়গণের কোন চেষ্টা সফল হয় নাই। বজ্রটি বোধ হয় আহতের মস্তিষ্ক দেশের সন্নিধানে আসিয়া আন্দোলনেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করিয়াছিল। ডাক্তারেরা অন্ততঃ এই মন্তব্যে তখন উপনীত হন।

আমি আমার নূতন কার্যে বারাসতে চলিয়া গেলে বঙ্কিম বাবু কয়েক বৎসর পর্যন্ত বারুইপুরে অবস্থিত ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম, বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন,—আদালতের কার্যের সময়েও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু একবার আলিপুর হইতে জয়নগর অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিষ্ণুপুরের ডাকবাংলায় এক রাত্রি অবস্থিতি করেন। পর দিন প্রাতে তিনি আমাদের বাটী আসিয়া আমার সঙ্গে তদুপলক্ষে দেখা করেন। আমি তখন মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। মিউনিসিপালিটি হইতে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু-ঘটনার বিবরণ আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু এতদঞ্চলে প্রেরিত হন।

আমার সঙ্গে দেখা করিবার পরই বঙ্কিমবাবু বাইসহাটা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যান। তাহার পূর্বদিন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী সেই গ্রামে গিয়া, যাহারা যথার্থই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত এবং অনাহারে বা কদর্য দ্রব্যাদির আহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসন্ধান-স্থল হইতে কৌশলে অনুপস্থিত করিয়া দিল, এবং যাহারা পুষ্ট দেহ ও তৈলাক্ত কলেবর,— যাহাদের গায়ে দুর্ভিক্ষের বাতাস কিছুমাত্র লাগে নাই, পুলিশ কেবল তাহাদিগকে

অনুসন্ধান-স্থলে উপস্থিত রাখিল। ইহারাই পুলিশ শিক্ষিত হইয়া বঙ্কিমবাবুর কাছে দুর্ভিক্ষের মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মশাই, আমরা এবার খেতে না পেয়ে মরি সরকার বাহাদুর এ সময় আমাদিগকে অন্ন দিয়া প্রাণে বাঁচান।" বঙ্কিমবাবু বাইসহাটা হইতে ফিরিয়া আমার নিকট তাঁহার অনুসন্ধানের দিন আনুপূবক বর্ণনা করেন। বঙ্কিমবাবু সত্য সত্যই পুলিশের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। যে লোকটি তথায় দুর্ভিক্ষে মৃত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, পুলিশের কৌশলে তাহাকে "রোগে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত" বলিয়া অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল। বঙ্কিমবাবু তৎপরে বাইসহাটা হইতে ফিরিবার পথে জয়নগর সন্নিহিত হাটপাড়া গ্রামের মৃত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি অবশ্যই দুর্ভিক্ষে "অনাহার প্রযুক্ত মৃত" বলিয়া প্রমাণিত হইল। পুলিশের কোন কৌশল জাল এখানে বিস্তারিত হয় নাই। যদি পুলিশ রিপোর্টে এই মৃত্যু বিবরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে পুলিশের কোন কৌশল জাল বিস্তার করিবার কারণ ছিল না, অথবা স্থানটি জয়নগরবাসীদের অত্যন্ত সন্নিহিত বলিয়া পুলিশ এখানে কোন চাতুরী করিবার অবসর পায় নাই বা সাহস করে নাই। বঙ্কিমবাবুর মুখে বাইসহাটার দুর্ভিক্ষ বিবরণ শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। তাহা আমাদের সংগৃহীত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিম-বাবু আলিপুরে ফিরিয়া গেলে আমি পুলিশের চাতুরী অবগত হইলাম। এরূপ চাতুরী অবলম্বন করাতে পুলিশের অন্য স্বার্থ ছিল না। উপর হাকিমদের ভয়েই তাহাদের এই চাতুরী অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সাহেব হাকিমদের কর্ণে দুর্ভিক্ষে জনিত কষ্টের কথা বড়ই তিক্ত লাগে। থানার পুলিশ রিপোর্টে একবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা থাকাতে পুলিশের বড় সাহেব থানার দারগার উপর বড়ই চটিয়া উঠেন। তাহাতে দারগাটি, মানসিক নৈতিক সাহসের অসদ্ভাবে, খুব সতর্ক হইয়া যান। যখন ২৪পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বঙ্কিমবাবুকে এ অঞ্চলে পাঠাইলেন, তখন তাহাদের সহসা আশঙ্কা জন্মিল। যদি কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রমাণিত হয়, আর যদি তাহারা তৎসম্বাদ পূর্বাহ্ণে উপরে না দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের উপর হাকিমদের সমস্ত তম্বি পড়িবারই কথা। দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলেও পুলিশের দোষ, না দিলেও তাহাদের দোষ। সেই জন্য শেষে দুর্ভিক্ষ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের উপর পাছে কোন দোষ পড়ে, তজ্জন্য পুলিশকে এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিতে হয়।

এরূপ স্থলে পুলিশের অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ", এগুলেও দোষ, পেছুলেও দোষ।

বাইসহাটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্নান আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস—বঙ্কিমবাবুর স্বগ্রামে—কাঁঠাল পাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথা বার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্য কালে কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন। আমার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সেই খানেই, তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। আমি পূর্বে নবজীবন পত্রিকায় "বৈষ্ণব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতাম। "এখন আর কোন প্রবন্ধ লিখিনা কেন" জিজ্ঞাসিলে আমি তদুত্তরে আমার শারীরিক অস্বাস্থ্যের বিষয় বলিলাম। "লিখিতে গেলে আমার বহুমূত্রের পীড়া বাড়ে।" তাহাতে তিনি 'এরূপ স্থলে না লেখাই ভাল' বলিলেন। "শীঘ্র পেন্সন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন"—এরূপ কথাও হইল। তিনি চির কালই সাহেবদের গালাগালির বড়ই ভয় করিতেন এবং সর্বদাই বলিতেন যে কোন উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবার উপযুক্ত আয় হইলে তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কথাটা এই, তিনি বহুদিন হইতে অনেক সাহেবকে কাজ শিখাইয়া এক প্রকার মানুষ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানাস্থানে চলিয়া গেলেন। এখন যে সমস্ত তরুণ বয়স্ক কার্যানভিজ্ঞ সাহেবেরা তাঁহার উপর হাকিম হইয়া আসিতেছে তাহারা আবার উল্টে তাঁহাকে কাজ শিখাইতে ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যায়রূপে ধমক দিতে চায় ও তাহাতে শ্লাঘা জ্ঞান করে। এরূপ দুর্ব্যবহার এখন তাঁহার ক্রমে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইয়াছি, একবার নাকি ২৪পরগণার কোন উদ্ধত ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার নিজ এজলাসের মধ্যেই কর্কশ ভাষায় "বঙ্কিম্" "বঙ্কিম্" বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিবার উদ্‌যোগ করিল। তাহাতে বঙ্কিমবাবু নাকি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, **"You should see, I am no longer "Bankim" now. I now represent her Majesty's law and justice. You know I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting her Majesty's**

court of justice." ইহাতে সাহেবটি অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে বঙ্কিমবাবু পদের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং শীঘ্র কার্য হইতে অবসৃত হইবেন স্থির করিয়াছিলেন।

এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় বঙ্কিমবাবু আরও আমাকে বলিয়াছিলেন যে "তিনি ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর শ্রাদ্ধ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, আহার সম্বন্ধে এরূপ ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হন।" তিনি চিত্ত-শুদ্ধির জন্য দেহ-শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং দেহ-শুদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন। অনেক ইংরাজী শিক্ষিতের নিকট হিন্দুর এই খাদ্যতত্ত্ব দুর্ভেদ্য সমস্যা হইয়া আছে। একদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও লেখকের সম্মুখে এ বিষয়ের ঘোর প্রতিবাদ করেন; তিনি এই মতকে ঘোর ("materialism") জড়বাদ বলিয়া মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ-পরমহংস-শিষ্য বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীও এ মতের বিরুদ্ধে সর্বত্রে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। খাদ্য-তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে হিন্দু ধর্মের প্রচার সত্য সত্যই বিড়ম্বনা।

পূর্বোক্ত ঘটনার সংঘঠন কালের ২।১ বৎসর পূর্বে ইণ্টারন্যাশন্যাল এগ্‌জিবিসন্ ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সহসা সাক্ষাৎ হয়। সে সময় তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমি তখন কার্যগতিকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ নবজীবন সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমবাবুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ করেন। বঙ্কিমবাবু কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন আমি কোন প্রকার যোগাভ্যাস করি। তৎসম্বন্ধে কথাবার্তা কহিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই অক্ষয়বাবু তৎপ্রেরিত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা হইতে, আমার কোন গুরুজনের বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ, ইহা আমি অক্ষয়বাবুর দ্বারা বঙ্কিমবাবুকে বলিয়া পাঠাইলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমাদের ও রেজেষ্টারী অফিসের বাটীতে সেই দেখা। সেই দেখার সময় আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটীতে গিয়া দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হই। তদনুসারে যখন প্রথম দেখা করি, তখন বঙ্কিমবাবুর

পেন্সন লইয়া কলেজ ষ্ট্রীটের প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় মধ্যে মধ্যে কয়েকবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রথম সাক্ষাতে তিনি আমাকে কৃষ্ণচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতে অনুরোধ করেন। আমি তাহা অধ্যয়ন করিবার পর সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বস্তুতঃ তাহা পাঠ করিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ও মৌলিক অংশ নির্দেশিত করেন, তাহাতে আমি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচার শক্তি দেখিয়া সত্য সত্যই অবাক্ হই। কিন্তু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্র স্থলে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় বঙ্কিমবাবু অতি অল্পই সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন। তবে এই পর্যন্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের যে অনুচিত ধারণা ছিল তাহা তিনি অনেকটা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু লোকে যে তখন শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবুর আদর্শ চরিত্র জ্ঞানে স্ব-স্ব গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে যাইবে ইহা বঙ্কিমবাবুর ওরূপ চেষ্টা দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তাদৃশ চেষ্টাদ্বারা শুদ্ধজাত কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক দোষ সাধারণের চিত্তবৃত্তি হইতে অপসারিত হইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের উপাসনার ভাব অভিনব-ভাবে অন্তরে উদ্দীপিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বঙ্কিমবাবুর একজন কৃষ্ণোপাসনাতে প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ হইয়া চৈতন্য প্রভুর ন্যায় স্বয়ং বৈরাগ্যব্রত গ্রহণান্তর সাঙ্গো-পাঙ্গে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া লোক মাতাইবার প্রয়োজন ছিল। এরূপ বৈরাগ্য ব্রতের অনুব্রতী হইয়া চেষ্টাপর হইতে পারিলে এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বী উৎসাহী প্রচারক দল স্বকীয় আদর্শে সংগঠিত করিয়া দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচার কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহার অভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইবার আশা থাকিত। খৃষ্টজগতে যেমন খৃষ্টোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, ভারতে এক্ষণে তাদৃশ সর্বব্যাপী কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার আশা স্বভাবতঃই খুব অল্প। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবেরও এপক্ষের চেষ্টা এপর্যন্ত একপ্রকার ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা ঠিক করিয়া বলিবার কেহই আমরা অধিকারী নহি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ। শুদ্ধ নীতির আদর্শ সাধারণ মানুষের মনঃপূতঃ হইবার নহে। এ সংসারে তা বড় প্রচুর নীতির আদর্শ

আছে। তাহারা কখনও কাহারও লক্ষ্যস্থানে আইসে না। সাধারণ মানুষে একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের এ অভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র পুস্তকের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি করিবেন কাকে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করাতে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি আরও দূরস্থিত ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যখন আমার এ সম্বন্ধে কথা-বার্তা হয় তখন তিনি উপরিউক্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বা ভক্ত জীবনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিষ্ণু পুরাণাদি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া কোথাও কিছু পান নাই। আমি বলিলাম, "বৈষ্ণব পূর্বাচার্যগণও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এ অভাবটী বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে জের টানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে পরিণত করিয়া একটি সম্পূর্ণ আদর্শ স্থানীয় করিতে কতকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের, প্রতিভার, বুদ্ধিমত্তার, তত্ত্বজ্ঞানের, নৈতিক অনুভূতি ও নিষ্ঠার অবতার, তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তির অবতার ও ভক্তের আদর্শস্থান। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ অভাব, শ্রীগৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণে প্রেম-ভক্তির আস্থা বিশ্বাসের, নির্ভর ও আনুগত্যের পূর্ণ আসম্ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব পূর্বাচার্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের একীকরণে একটি পূর্ণ আদর্শ চরিত চিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণে তাহা কুলায় নাই, শুদ্ধ গৌরাঙ্গেও তাহা কুলায় নাই। যেমন তাঁহাদের রাধা ও কৃষ্ণ লইয়া একটি সত্তা সৃষ্টি, তেমনি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া একটি সত্তার স্ফূর্ত্তি।"

নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একদিন বঙ্কিমবাবুকে কৃষ্ণ চরিত্রের বৈরাগ্যের অভাবের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যহীন জীবন কিরূপে লোকের চিত্ত বৃত্তি আকর্ষণ করিবে। এ কথার বঙ্কিমবাবু প্রায় নিরুত্তর হন। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম সংস্থাপক মাত্রেই বৈরাগী। বুদ্ধদেব ও চৈতন্য প্রভু বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল। ঈশা, মহম্মদ, নানকও বৈরাগ্যের বড় সামান্য দৃষ্টান্ত স্থল নহেন। ভারতের সমস্ত ধর্ম সংস্থাপকেরাই

সন্ন্যাসী। একা বুদ্ধদেব ব্যতীত ইঁহারা সকলেই ভক্তিবিশ্বাসী। বুদ্ধচরিত্রে ভক্তি বিশ্বাসের অভাব কেবল মাত্র এক বৈরাগ্য দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে। এই সকল কথাবার্তার সময় বঙ্কিমবাবু কখনও অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহা তাঁহার গভীর সত্যনিষ্ঠার পরিচয় সন্দেহ নাই।

একদিন আমি কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম যে আপনি কৃষ্ণ চরিত্রকে দুরবগাহ কলঙ্ক রাশির আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য অবশ্যই আপনি বর্তমানের বিশেষতঃ ভবিষ্যতের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার চেষ্টা প্রথম ও সর্বাগ্রবর্তী নহে। আপনার পূর্বে স্বামীজী শ্রীগন্দয়ানন্দ সরস্বতী এবিষয়ে প্রথম চেষ্টাপর হন। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দল হইতে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় একবার কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধারের চেষ্টা হয়। তিনি এ বিষয়ের কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমিই তাঁহার প্রথম সংবাদদাতা।

এতদ্বারা এবং আরও নানা বিষয়িনী কথা দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্যের—বিশেষতঃ ধর্ম্ম সাহিত্যের—কোন ধারই ধারিতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্যপোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব। তিনিই কেবল তাঁহার সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে বাস্তবিক সামুয়েল জন্‌সন স্থানীয় ছিলেন। যদি তিনি বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যের রীতিমত তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলের হইত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের শকটাবলীকে সুপথ দেখাইয়া উন্নতির পথে পরিচালনা করিতে অধিকতর সামর্থ্যবান হইতেন সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমবাবু পুত্র সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যা দৌহিত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। দৌহিত্রদিগের সঙ্গে তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটিকে হার্মোনিয়ম বাজাইতে ও তৎসঙ্গে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন তাহাদের সঙ্গে খুব বন্ধুভাবে মেশামেশি না করিলে তাহারা অন্যত্র বন্ধু অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে। অন্য সঙ্গে নষ্ট বা বিকৃত হইবার বাধা কি? একদিন তাঁহার যুবক দৌহিত্রটীকে ডাকিয়া আমাকে তাহার গান-বাদ্য শুনাইলেন।

একদিন বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি পথিমধ্যে এক ব্যক্তি একখানি হ্যাণ্ডবিল আমার হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সিকাগো মহামেলা হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্মাননা ও অভ্যর্থনার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেখানি বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে দিলাম। বঙ্কিমবাবু তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যথাসময়ে তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন এবং আমাকে যথাসময়ের পূর্বে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া যাইতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অভ্যর্থনার দিন এক মাঘের একাদশ দিবস। আমি বলিলাম যে আমার শরীরে কোন প্রকার হিম্ সহ্য হয় না; আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও অভ্যর্থনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে "তাঁহার কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহার খুবই হিম সহ্য হয় কিন্তু রৌদ্র আদবেই সহ্য হয় না। একটু রৌদ্র গায় লাগিলে তাঁহার দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।" একদিন দেখিলাম, তাঁহার যুবক দৌহিত্র সেদিন বৈকালে প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করিবে। তিনি দৌহিত্রটিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলেন। গাড়ীটি তাঁহার বাটীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল এবং দৌহিত্রটীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে ২।১ মিনিটের অধিক সময়ও লাগিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপিও বঙ্কিমবাবু ছত্র হস্তে তাহার অনুগমন করিলেন এবং ছত্রটি খুলিয়া পশ্চিমাভিমুখে বহির্দ্বারে রৌদ্র হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমবাবু রৌদ্র হইতে এতদূর সতর্ক হইতেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল। আমি উক্ত মহাত্মার কোন গুণ কীর্তন করিলে, তিনি তাহাতে বড় একটা অনুমোদন প্রকাশ করিতেন না। উক্ত মহানুভব পুরুষ নিজের লেখায় বা কথায় কখনও কোনও প্রচলিত উপাস্য দেবদেবীর প্রতি বা প্রচলিত শাস্ত্র-সমূহের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, একথা বলাতে বঙ্কিমবাবু তাহাতে সায় না দিয়া কতকগুলি খৃষ্টীয় পুস্তিকা বাহির করিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "qutations from the writings of Ram Mohun Roy" উদ্ধৃত ছিল। তাহার এক স্থানে দেবদেবীর যথেষ্ট নিন্দাবাদ দেখিলাম। কালীমূর্ত্তির বর্ণনায় উক্ত মহাত্মা যে কেবল শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ

করিয়াছেন তা নয়, গভীর অশ্রদ্ধাও দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। সে সমস্ত পাঠ করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম যে "হয়ত এই সমস্ত লেখা রাজার অপরিপক্ক বয়সের। রাজা যে সময়ে তাঁহার Appeals to the Christian Public প্রকাশ করেন, কিম্বা আরও পরিপক্কতর বয়সে যখন তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সুবিখ্যাত 'Trust Deed' পত্র প্রকাশ করেন, সে সময় নিশ্চয়ই দেবদেবীগণকে এরূপ নিন্দাবাদ করিবার প্রবৃত্তি রাজার মনে সম্পূর্ণ সংযত হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়ে রাজার লেখাতে দেশ-প্রচলিত শাস্ত্রের ও লোকের উপাস্য দেবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়া তিনি নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতেন।"

নববিধান প্রবর্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশ বিখ্যাত হইয়া পড়েন আমি যখন বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বঙ্কিমবাবুর অধীনে আছি— যখন তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" আলোকের মুখ দর্শন পর্যন্ত করে নাই— যখন তাঁহার যশোসূর্যের অরুণোদয়ের লেশ মাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোন স্থানে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন "I wish to know how far you have outgone me"। একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি। সে সময় কেশববাবুর জিজ্ঞাসা মতে আমার সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হয়। সে কথা যাউক, বঙ্কিমবাবু কোন কাজেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার প্রবর্ত্তক মহাশয়ের তুলনীয় মনে করিতেন না। এই কথাবার্তার সময় প্রতাপবাবু সিকাগো মহামেলা উপলক্ষে আমেরিকায়। সেখানে প্রতাপবাবুর বক্তৃতাদি সে দেশের, এদেশের এবং অন্যান্য সভ্য দেশের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি প্রতাপ বাবুর লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশংসা করিয়া বলিলেন "প্রতাপবাবু গুছিয়া গাছিয়া বেশ ইংরাজি বলিতে ও লিখিতে পারেন এবং শেষে যাহা দাঁড় করান তাহা মন্দ হয় না বরং ভালই হয়।" "As a leading power" নেতৃত্বশক্তি বিষয়ে তিনি প্রতাপবাবুকে সম্পূর্ণ একটি "Failure" বা অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করেন। কেশববাবুর ও Leading power তাঁহার মতে খুব বেশী ছিল না। তিনি বলিলেন যে "অনেক সময় ও শ্রমব্যয়ে

কেশববাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিতে না করিতে সেই অসংসক্ত দলটি বহুধা বিছিন্ন হইয়া তাহার গঠন-দৌর্বল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।” আমি ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, কেশববাবুর অনুবর্ত্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাস্পদ ও সাধু চরিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধর্মানুরাগ সমাধিক প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে তাহা মনে হয় না। তাঁহারা একদিন কেশববাবুর নাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ও কথায় তিনি বলিলেন,—“কালীনাথ, তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে ও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। উহার যে অবসাদ দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।”

শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায়ের “কৃষ্ণ চরিত্র” সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, “গৌরবাবু একজন সুপণ্ডিত লোক, শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এজন্য তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্র যেমন ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে, তেমন যুক্তি দ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের মৌলিকতা, প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।”

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে সহসা এক আধটি প্রচলিত ইতর শব্দ স্বেচ্ছা পূর্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার লিখন প্রণালী সমর্থন করিবার জন্য কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিয়াছিলেন।

সঞ্জীববাবু (বঙ্কিমবাবুর মধ্যম ভ্রাতা) “জাল প্রতাপচাঁদ” অভিধেয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ধমানাধিপতি মহারাজা তিলকচন্দ্রের “প্রতাপচাঁদ” নামক একটি পুত্র ছিলেন। তিনি কোন কারণে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পিতার রাজত্বকালে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। তজ্জন্য তিলকচন্দ্র মহাপ্রতাপচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া রাজত্ব রক্ষণ-ভার নাবালক মহাতাপচন্দ্রের জন্মদাতা গোপালবাবুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কিছু সময় পরে “প্রতাপচাঁদ” নামধারী কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বর্ধমান রাজ সম্পত্তির (claiment) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। এই পরিচয় দিবার পর নামধারীকে কোন

মোকর্দমা উপস্থিত করিবার অবসর দেওয়া হইল না। নাবালক রাজের অভিভাবক গোপালবাবু বর্ধমান এষ্টেটের বিপুল অর্থভাণ্ডার অকাতরে ও মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়া নামধারী দায়াদ ও তাহার পক্ষীয় লোকদিগকে ব্যতিবস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া উড়াইয়া দেন। নামধারী কোথায়ও দাঁড়াইবার ভূমি পান নাই। সঞ্জীববাবু এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকাখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, "মেজদাদা জন-প্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর অবিচারে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকার বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের ঐতিহাসিক মূল তিনি অতি অল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমার খুব বাল্যকালে এই নামধারীর আখ্যান জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিতাম এবং সহানুভূতিতে কাঁদিয়া গণ্ডস্থল ভাসাইতাম।" আমি বলিলাম যে "দায়াদের যখন বহুতর ভূম্যাধিকারী সহায় থাকিতে এবং খ্যাতনামা জনসাধারণহিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিগত অভিন্নত্বের (Identity) প্রমাণ সকল থাকিতে দেওয়ানি আদালতে যে তাঁহাকে মোকর্দমা রুজু করিতেও রাজকীয় ও অন্যদীয় পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, তখন নামধারীর প্রতি অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।"

ফরাসী সম্রাট নেপোলেয়োঁ বোনাপার্ট সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে বিষয়ে ("English prejudice") ইংরাজী কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছে। তিনি উক্ত মহাত্মার প্রতি 'নৃশংস' ভিন্ন কোমলতর আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বোধহয় সর ওয়াল্টার স্কট, বুরিণ, আলিসন প্রভৃতি শুদ্ধ বিপক্ষবৃন্দের জীবন চরিত্র ও ইতিবৃত্ত সমূহ পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে এই ঘোর অমূলক কুসংস্কারকে বদ্ধমূল হইতে দিয়া থাকিবেন ; লাকেশ, হাজলিট, আবট, কর্ণেল নেপিয়র, স্লোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন নাই।

বঙ্কিমবাবু ইয়ুরোপীয় ও অপর বিদেশীয় লোকের মুখে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা মনে করিতেন। এ জন্য তিনি আনি বেসাণ্ট প্রভৃতির বক্তৃতাদির প্রতি কোনও অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। বরং তিনি শ্রদ্ধাপদ শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির প্রতি আকর্ষণ দেখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এখন সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কিনা?" উত্তরে বলিলাম, "সিদ্ধযোগী অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহাদের দর্শন লাভ বা তাঁহাদের উপদেশ লাভ ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্য পাত্রের সৌভাগ্য ও সুকৃতির অপেক্ষা করে।" "যোগ" সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপের নিষেধাজ্ঞা ছিল,। তিনি জানিতেন। এজন্য তৎসম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। যদিও প্রথমে এই জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কালীনাথ! তুমি কোন প্রকার মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস কর কিনা?" "আমি খুব বিশ্বাস করি" বলিলাম। আমি বলিলাম "যে আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন তিনি ময়মনসিংহের অন্তবর্তী মুক্তাগাছার একজন জমিদার। কামাখ্যা হইতে একটী ব্রাহ্মণ তনয় অনেক মন্ত্রাদি শিখিয়া আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার বন্ধুটী তাঁহার কাছে তৎ-শিক্ষিত কোন মন্ত্রের শক্তি-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় দেখিতে চান। তাহাতে ব্রাহ্মণ তনয় একটা উদ্ভিদ্ লতার উপর তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্র-শক্তি বলে, লতাটি যেদিকে ছিল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুস্থির হইল।" আমার কথা শেষ হইয়া মাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে "তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটি জানেন। সেই মন্ত্রটি কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলেও মানুষের মন মন্ত্র প্রযোক্তার ইচ্ছা বশীভূত হয়। তিনি এই মন্ত্রটির কোন বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না তবে হাকিম বা সাহেব বশীভূত করিবার জন্য তিনি অনেক লোককে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। একবার তিনি কোন হতভাগিনী স্ত্রীলোককে, তাহার অননুরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটীর প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটি তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অযথা অপব্যবহার করে।" মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মন্ত্রশক্তির ফলোপদায়িতা যেরূপে নষ্ট হয় আমি তাহার একটি ঘটনা বিবৃত করিলাম। ঘটনাটি আমি শ্রীমৎ অচলানন্দ তীর্থ-স্বামীর মুখেই শ্রবণ করি। স্বামীজীর পূর্বাশ্রম উত্তরপাড়ার সন্নিহিত কোংরং গ্রাম, সেই আশ্রমখ্যাত নাম রামকুমার বাবাজী। বাবাজী তাঁহার অবশ্যই পদবী নহে। তবে 'বাবাজী' শব্দ লোকে তাহার পদবী স্থানে

প্রয়োগ করিত। স্বামীজী যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট বৃশ্চিক দংশন আরোগ্যের একটি মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রটি পাইবার জন্য স্বামীজী পূর্ব হইতে বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের নিকট সে আগ্রহ কখনও প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব মন্ত্রোচ্চারণান্তে দষ্টস্থানে থুথু করিয়া তিনবার থুৎকার করিতেন। সেই অব্যর্থ মন্ত্র-শক্তি বলে, যাহারা আসিত সকলেই সকল সময় আরোগ্য লাভ করিত। দৈব যোগে একদিন স্বামীজীর মাতামহী বৃশ্চিকদষ্ট হন। সেই দংশনে বা হুলাঘাতে মাতামহীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দংশন গোপনীয় স্থানে হওয়ায় স্বামীজীর পিতৃদেব আপনার শ্বশ্রুঠাকুরাণীর দষ্ট স্থানে ফুৎকারের সহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বামীজীকে ডাকিয়া প্রয়োগের কৌশল সহিত মন্ত্র দীক্ষা দিলেন এবং স্বামীজীকে তাহা তাহার মাতামহীর দষ্টস্থানে যথাবিধানে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। প্রয়োগ মাত্রই মাতামহীর অসহ্য যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল। স্বামীজী তৎপরে শত শত লোককে সফুৎকার মন্ত্রবলে আরোগ্য করেন। একদিন মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পিতৃদত্ত সফুৎকার বৃশ্চিকদংশন আরোগ্যের মন্ত্রের সফলতার কথা বলেন। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে কেহ বলিল যে হয়ত শুদ্ধ ফুৎকারে আরোগ্য হয় মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নহে। এই কথাতে স্বামীজী পরে তাঁহার মন্ত্র-সম্বন্ধে নিজের মূঢ় বিশ্বাসটী পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তির দংষ্টস্থানে বিনা মন্ত্রোচ্চারণে কেবল শুদ্ধ ফুৎকার দিলেন, তাহাতে জ্বালা নিবারিত হইল না দেখিয়া সেবার তিনি যথারীতি সমন্ত্রোচ্চারণ ফুৎকার দিলেন, তাহাতেও কোন উপকার দর্শিল না। তারপর স্বামীজীর সে মন্ত্র চিরকালের তরে অসিদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্বে তাঁহার মন্ত্র-প্রয়োগ কদাপি বিফল হয় নাই। এই ঘটনাটী দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে মন্ত্রটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানকৃত পরীক্ষাপেক্ষা মূঢ় বিশ্বাসের পক্ষপাতী।

এই কথার পর Magnetism "Will power" ও গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। নিম্নে তাহার স্থূল মন্তব্য অভিব্যক্ত হইতেছে। আমাদের উভয়ের মতেই মন্তব্যগুলি স্থিরীকৃত হয়।

(ক) শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে রোগাদি আরোগ্য হয় ও হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি সকল সময়ে স্থায়ী নহে। প্রয়োগ কর্তার প্রয়োগাধীন ব্যক্তি (subject) অপেক্ষা অধিকতর মহাজন ভাবাপন্ন (More positive) হওয়া চাই। এবং এই

ইচ্ছাশক্তি কোথাও কখনও (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ নহে। (বঙ্কিমবাব বলিলেন তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে। অতি অল্প স্থলেই তিনি তাহ প্রয়োগ করেন)। এই ইচ্ছা শক্তির সমধিক প্রয়োগ ও ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেহগত স্বাস্থ্য ও বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার আশঙ্ক আছে।

(খ) গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রদাতার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে এবং তাঁহার আজ্ঞার উপর সমধিক নিষ্ঠা (implicit obedience) না থাকিলে কোথাও ফলোপদায়ী হয় না। মন্ত্র প্রয়োগকালে মন্ত্রদাতাকে স্মরণ করিতে হয় এবং আপনার শক্তি-সাধ্যের অহঙ্কার বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রদাতার শক্তি সাধ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। যথা নিয়মে প্রযুক্ত মন্ত্রশক্তি সকল স্থানেই (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ। ইহা কোথাও নিষ্ফল হয় না। ইহার যথেষ্ট ব্যবহারে শরীরের বলক্ষয় হয় না, ইচ্ছাশক্তিরও সাহায্য লইতে হয় না। প্রয়োগকালে যে মনের বল উপস্থিত হয়, তাহা আপনা হইতে অতি সহজে, শুদ্ধ মন্ত্রের বলে উপস্থিত হয়। এই মন্ত্র-শক্তি শুদ্ধ ভক্তির বলে ফলোপদায়ী হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তির স্থলে শুদ্ধ দৈববলই সম্বল। ইচ্ছাশক্তি কাহাকে কখনও প্রদান করা যায় না, কিন্তু মন্ত্রশক্তি গুরু-প্রণালী ক্রমে অনায়াসে উপযুক্ত পাত্রে সর্বদাই প্রদত্ত হইতে পারে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে তাঁহার দুইজন মন্ত্র-শিষ্য আছেন। তাহারা তাঁহার প্রণালী ক্রমে ইষ্টোপাসনা করিয়া থাকে! তিনি শিষ্যদ্বয়ের ভক্তি বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার পূর্বোক্ত আকর্ষণী মন্ত্রটী তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। এই শিষ্যদ্বয় বঙ্কিমবাবুরই উপাসনা প্রণালীর অনুগত। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং প্রচলিত গুরু প্রণালী ক্রমে ইষ্টোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের কৃত প্রণালী অবলম্বন করেন। স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যে উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিয়া যান, তাহাই বর্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের অবলম্বন হইয়াছে। ভট্টাচার্য মহোদয় যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্তোত্র, শ্লোক ও মন্ত্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত করেন, বঙ্কিমবাবু সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্তোত্র ও শ্লোকাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিয়া নিজে তাহা অবলম্বন করেন এবং শিষ্যদ্বয় মধ্যে তাহা প্রচলিত করেন। সঙ্কল্পিত পরীক্ষান্তে এই শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার আকর্ষণী মন্ত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি না, এবং আমার

সঙ্গে এই আলাপের পরে আর অধিক মন্ত্রশিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু এ কথার ৫।৬ মাস পরে তাঁহার জীবন লীলা সম্বরণ করেন।

তিনি একদা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের উপাসনার সময় সম্যক মনঃস্থির করিতে সকল সময় সক্ষম হন না। কোন বিশেষ শব্দ বা লোকের কথাবার্তা বা বালকাদির ক্রন্দন বা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে তাঁহার চিত্তবৃত্তি অস্থির হইয়া উঠে। এমনকি উপাসনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাকে উপাসনায় ভঙ্গ দিয়া, ব্যাপারটা কি! তাহা উঠিয়া দেখিয়া সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হয়। আমি বলিলাম যে পরিবারস্থ সকলের প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বা মায়া থাকাতে সর্বদাই তাঁহাকে চঞ্চল করে এবং তাঁহার উপাসনায় বাধা জন্মায়। কে কোথায় পড়িয়া গেল, কে কোথা হইতে কোন ব্যথা পাইল, কোন দিক্ হইতে কোন্ আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই সমস্ত কায়িক আশঙ্কা মনোমধ্যে সর্বদা উদয় হইয়া তাঁহাকে চতুর্দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং বিক্ষেপ জন্মায়। তাঁহার বৃত্তিকে স্নেহার্দ্রতা হইতে একটু কঠিন করিয়া না তুলিলে স্থির চিত্তে তাঁহার উপাসনা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যে তাঁহার উপাসনার বাধা একথা তিনি অস্বীকার করিলেন না। মনের বশীকরণ শক্তির অসদ্ভাব যে অধিকাংশ উপাসকের বাধা হইয়া আছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই চাঞ্চল্য নিবারণার্থ বহুতর সাধককে অষ্টাঙ্গ যোগাদি অভ্যাস করিতে হয়। অবশ্যই কোন প্রকার যোগের কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই এবং নিষেধ ছিল বলিয়া আমি তাঁহাকে বলিতে পারি নাই। তাঁহার চিত্ত বৃত্তির অস্থিরতার আর একটি কারণ, তখন আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাছে সে কথা বলিলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য তখন তাহাকে বলিতে বিরত ছিলাম। সেই কারণটি—উপাসনা সম্বন্ধে গুরু প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিজকৃত প্রণালী, নিজের উপাসনার জন্য অবলম্বন করা। বঙ্কিমবাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজে উপাসনা করিতেন সেই উপাসনার মূলে গুরুদীক্ষা বা গুরুভক্তির সাহায্য ছিল না, তাঁহার আজ্ঞা-জনিত নিষ্ঠার সদ্ভাব ছিল না। এই জন্য কাহারও আপনাকে আপনার গুরু-স্থানীয়রূপে বরণ করা বিধেয় হয় না। যে দৈব বা অদৃশ্য শক্তি (Providence) গুরু-প্রণালীর মূলে বর্তমান থাকিয়া তাহার প্রাণ ও সহায় হইয়া আছে, আপনাকে

গুরুত্বে বরণ করিলে সে সাহায্য-প্রস্রবণ হইতে নির্ভিন্ন হইয়া পড়িতে হয়, সুতরাং সে সাহায্য বঞ্চিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমবাবুকে সেই সাহায্য স্রোত হইতে বঞ্চিত হইয়া প'ড়িতে হইয়াছিল। যাহা—যে শক্তি শুদ্ধ Rationalism এর বৌদ্ধ ভাবের অধিষ্টাত্রী দেবতা তাহাই কেবল তাঁহার সহায় ছিল। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির পূর্ব বর্ণিত বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।

বঙ্কিমবাবু যেরূপ স্বকীয় বা স্বকৃত উপাসনাপ্রণালীর অধীন হইয়াছিলেন, পূর্বাচার্যগণের কেহই, নিশ্চয়ই, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান নাই। স্মার্ত মহোদয় যখন ব্রাহ্মণগণের জন্য উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিজের গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন অনুবর্তীদিগের জন্য কৃষ্ণমন্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন পুরী-গোস্বামী-প্রদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায়" ও তাঁহার প্রদর্শিত উপাসনা প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণমন্ত্র, বা স্বকৃত পূজাপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার কোন পার্শ্বদগণকেও তাঁহাদের গুরুমন্ত্র ও গুরুপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণ মন্ত্র ও স্বকৃত উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ ও বাধ্য করেন নাই। কেবল বিশ্বাস ও ভক্তি পরীক্ষার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের জনৈক রামাৎ বৈষ্ণবকে কৃষ্ণনাম করিতে বলিয়াছিলেন মাত্র, তাহাকেও তাহা করিতে বাধ্য করেন নাই। কোন প্রণালী প্রবর্তক স্বকীয় গুরু-প্রণালী বিসর্জন করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। যিনি তাহা করেন, তিনি তাঁহার ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আমরা বঙ্কিমবাবুকে বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ভিন্ন কখনও অন্য কিছু ভাবি নাই। তাঁহার লেখায় কৃষ্ণাবতার স্বীকার ও ভক্তিতত্ত্বের কথা থাকিলেও তিনি পূর্ণমাত্রায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন (Rationalist)। ব্রাহ্মচূড়ামণি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইতি পূর্বে হিন্দুধর্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রাহ্ম উপাসনাপদ্ধতি প্রস্তুত করেন তখন তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক বৌদ্ধভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?

বঙ্গীয় যুবক সমাজ মধ্যে সাহেবিয়ানার ঘোর প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকেই আহারের সময় হাতে তুলিয়া খাওয়ার পরিবর্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করেন, গৃহ মধ্যেও বস্ত্রব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পেণ্টুলেন সার্ট ব্যবহার করেন, এবং ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিবার পরিবর্তে আহারের জন্য টেবল ব্যবহার প্রবর্তন করেন। অনেক যুবক এইরূপ বিলাতী সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া

হাবু-ডুবু খান। বঙ্কিমবাবুও এই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া তৃণের ন্যায় নীয়মান হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। এ সম্বন্ধে একদা তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময় কাঁটা চামচ ব্যবহার না করিয়া হাতে তুলিয়া খাওয়া বড়ই ঘৃণার বিষয় ও ঘোর অসভ্যতা মনে করিতেন। এরূপ অসভ্য ব্যবহার তাঁহার চক্ষে পড়িলে তাঁহার অন্তরে বড়ই ঘৃণার উদয় হইত। একদিন কাঁটা চামচ হস্তে একটা কৈমাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিফল প্রযত্ন হইতেছিলেন; তাঁহার সহধর্মিনী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "কি বিড়ম্বনা! উপায় থাকিতে কি কর্মভোগ!" এক কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সময়ের স্রোত বিপরীত দিকে ফিরিবার উপক্রম হইতে ছিল। এই স্রোতের বশবর্তী হইয়া তাঁহারও সাহেবিয়ানা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এদেশে যে এ স্রোত এখন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে তিনি যারপর নাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পিতৃদেব পূজনীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন সন্ন্যাসী গুরু বা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটনার ঠিক ৭দিন পূর্বে আসিয়া তাঁহার সংগে মিলিত হইবেন অঙ্গীকার করিয়া যান। অঙ্গীকার মত মৃত্যুর ঠিক ৭দিন পূর্বে সন্ন্যাসী ঠাকুর যাদববাবুর সংগে আসিয়া দেখা করেন। যাদববাবুর কোন পীড়া উপলক্ষে নাকি এই সন্নাসীর সংগে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু আরও অনেক কথা বলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥

বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটি ষ্টেশন হতে তাঁর বাটি যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্যভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুই ঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, এক ঘর ফুলে, আর এক ঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধা-বল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসের তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনীতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়, প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রয় হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়ি মুড়কি, মটর ভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে ভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশি কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিষ এই মেলায় বিক্রী হয়—নানারকম গাছের কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা আমের কলম, লেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপ জামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফলসার গাছ এবং গোলাপ, যুঁই, জাতি, বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ, বক, কুরচ, কাঞ্চন, টগর সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম

পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালিরা, যে কোন গাছের চারা পাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল-নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোতালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল নাচ হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীদমন, এসব ত ছিলই ; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ্ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত-পা নাড়ে আর হাসে।

রাধাবল্লভের বাটির গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ি বলিলে অনেকই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ি যাইতেন, সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল ; কুঞ্জ ছিল ; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা ; অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচাবাড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ি লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন ; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে ; সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়িরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানারকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া যায়। কোন দিন কোন সাজ হবে আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক খোলা গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায়

রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিনের যাত্রা হয় মাত্র, আগে আটদিনই খুব জমজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণদিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণদিকে শিব মন্দির সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্বদিক দুটি দরজা একেবারে খোলা জমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুইটি জানালা, ঘরটি পূব-পশ্চিমে লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত পূবের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত; পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলা শুইতেন, পূর্বের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি তাঁহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণদিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবেনা। ঘর দুটি একত্রে যতখানি লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথা, হাতখানেক উচা, তাহার মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজানো থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে সুরকীর কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যুঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার

গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমার বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, "তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।" সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন, জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলেপিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ি বড় একটা যাইতাম না! একবার ধরণী কথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দু'চার দিন ধরণী কথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ির পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকী ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপরে একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণী কথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চস্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া হাতের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ি হইতে কিছুদূর, পুবদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুল বাগানে ধরণী কথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সে দিকে যাই নাই। চারি পাঁচ দিন ধরণী কথকের

কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই, তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকর একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র **"On the highest ideal of woman's Character as set forth in Ancient Sanskrit writers"** একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি বি, এ, পাস করিলাম; উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন, সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকায় বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম, রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন, এবং কতকগুলি বেশ মিষ্টকথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন, এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম এম, এ ক্লাস পর্যন্ত ত একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরী পাওয়া যাইবেনা। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ; আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং

তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক, তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলায় ছোট গোলদীঘির ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি; শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ি যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাটি যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ি গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "'আর্যদর্শনে' যাহা লয় নাই, 'বঙ্গদর্শনে' তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে পৌছিব।" যথা সময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণবাবুর বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণবাবুর বাড়ির দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ি ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্তা

চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যে কোনটি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ি নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি, এ, পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হঁা।" তখন বঙ্কিমবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ি, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি, এ, পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাহারা সকলেই তো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয় কেন?" "শুনিয়াছি কামিনী গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প করিতে লাগিলেন। দেখিলাম দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, "বাঙ্গালা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্বত কন্দর' আছে।" বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম, এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষককে জানিয়াই আমার ঐরূপভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া

দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম। রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময় কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচারব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল "রামফক্কড়"। নৈহাটি ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়িতেই তাঁর অবারিত দ্বার ছিল। তিনি সব বাড়িতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদরযত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ি যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। একদিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিলেন, "তুমি বঙ্কিমকে কি দিয়া আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "একটা লেখা।" তিনি বলিলেন, "তাই বটে। বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'নন্দর ভাইটি বেশ বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছে।' তুমি সেখানে যাওনা কেন? বোধ হয় গেলে সে খুসী হবে।" রাম বাঁড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে? তুমি এমন বাঙ্গালা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেলা।" তিনি বলিলেন, "ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাংলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত হইতে বুঝিলাম যে, বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কটি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকিগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রী চরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।" তাহার পর যখন নৈহাটি হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই

তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলংকার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই একজন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্য প্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন, এবং ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি লইয়াই থাকিতে। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্ গুন্ করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি ছাপাইয়াও বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স" (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" বলিয়া 'বঙ্গদর্শনে' সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য

প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া তাহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্বে বাংলায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য ও অনার্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশি কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। আমার 'ভারত মহিলা' লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়, কেন না 'বঙ্গদর্শনের' গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও 'বঙ্গদর্শনের' টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরি যায়।* তখন দিনকতক

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রিক্ট টাউনস অ্যাক্ট' পাশ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজ সাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে; সকল হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন, "আর ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলা কে বুঝিবে? ও গুলা ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-laws lane বলিতে হইবে।" জজ সাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।" জজ সাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া

তিনি সব্ রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই 'বঙ্গদর্শন' এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের' সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে 'বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, 'বঙ্গদর্শন' এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন 'বঙ্গদর্শনে' নূতনের মধ্যে আমি; আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়েছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিজা বাঁধান একখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আনিয়া আমাকে দিলেন, "রেল গাড়িতে এইখানি পড়িও ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।" আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই আমার বাড়িতে নাই। বৌঠাকুরাণীরা অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন; এখন পুত্রেরা বড় হইয়া আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন। আমার এত যত্নের জিনিষ একখানিও বাড়িতে নাই!

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম, তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাসে সে ঘর-গুলিতে চাবী বন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম;

হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজ সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজ সাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজ সাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাশ করিতে না পারিবার কার্যকারণ তার সম্বন্ধ আছে কিনা, জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন, আছে।

দেখিলাম চুঁচুড়ায় যোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন; একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন সেটি একতালা। বাড়িটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্বেও দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেদিন তার নীচে খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে? তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্মাণ পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'— অর্থাৎ তিনজন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব অগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিনজন কবি বাইরণ, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের বন্ধুত্বের কথা বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত সমাজে বিখ্যাত। ইঁহারা যখন উভয়েই বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চোদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। সর্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত, আদরের কবিতা কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত প্রভাকরে দ্বারকানাথ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন, সংবাদপত্রে উহাকে কবিতা যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল।

আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে,—একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে—পত্রে কি লিখিয়াছে?' তিনি কোন উত্তর না দিয়া আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি দেখি' বলিয়া উহা তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম —আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এই স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, পরক্ষণেই নরম সুরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন "লিখব বই কি।"

আমি তখন দীনবন্ধুর নাম শুনিয়াছিলাম। প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন সংবাদপত্রে কবিতার নীচে দীনবন্ধুর নামও দেখিতাম।

দীনবন্ধুর বাল্যকালের পত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্সের ভিতর থাকিত, সেগুলি কি হইল তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ পত্রগুলি যে এক্ষণে সাহিত্য

সমাজের বিশেষ আদরের হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহার চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোন এক বিশেষ সরকারী কার্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে স্থলের একজোড়া জুতা যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটি ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা—"বঙ্কিম কেমন জুতো।" পত্রখানি আমি পড়িয়াছি অনেকেই পড়িয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন তাহা তখন আমরা জানিতে পারি নাই। পরে দীনবন্ধুর অগ্রজের নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—'তোমার মুখের মতন।'

হাস্যরসে ও বাকপটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাহার নিকট পরাস্ত হইতেন, কেবল এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পরাভূত করিতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণ কুলীনের সন্তান, স্বাধীন অর্থাৎ জমিজমা চাষবাস ইত্যাদিতে সচ্ছন্দে তাঁহার জীবন নির্বাহ হইত। ইনি ভাঁড়ামিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ওরফে গুয়োতুম্বো মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটিতে আসিতেন, কিন্তু এই ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইহার নাম মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে গান শুনিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা পান নাই। ইনি সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকিতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে দীনবন্ধু বঙ্কিচন্দ্র এবং অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এমন সময় ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্য মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় নহেন) উপস্থিত হইলেন, শিষ্যগৃহে আগমন উপলক্ষে ইঁহার সর্বদা কৃষ্ণনগরে যাতায়াত ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির কথা কহিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ সহকারে উহা শুনিতেছিলেন, উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজোড়া ঘুঙুর পায়ে নিয়া একটি গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। (ঘুঙুর জোড়াটি ঐ ঘরে সংগ্রহ করা থাকিত)। —গীতটি এই—

"কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।"

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধুও খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও তাঁহার পত্নী গোলাপ ফুল—বাবলা গাছে গোলাপফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্নীসহোদরবাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। এই বৎসর শ্যামাপূজার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুজ ভ্রাতাদ্বয় যখন কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ইহাকে ফোঁটার দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আহারের সময় বড় গোল বাঁধিল। ছাই পাঁশ গরুর চোনা ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাওয়াইবার জন্য দীনবন্ধু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সাধ্বী পতি পরায়ণা যিনি ভাই-ফোঁটা দিয়াছিলেন তিনি অদ্যাপি জীবিতা।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বহাল হইয়া যান, দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোষ্ট অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্যের কি শুভ ফল ফলিল তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। এই মিলনের পর হইতে দুইজনে প্রধান লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন। একজন বঙ্গের প্রধান নাটককার হইলেন, দ্বিতীয় প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি নীলদর্পন রচনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্গেশনন্দিনী প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ যে সাহিত্য সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিমকোট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন দীনবন্ধুর প্রধান নাটকখানি সর্বাংশে শক্তিশালী এবং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত এবং সুদূর বোম্বাই সহরে পর্যন্ত অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য জগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছে তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে প্রথমত কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজিওয়ালারা অবশ্য

গুহাত তুলিয়া বাহবা দিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি সামান্য ঘটনা এস্থলে প্রকাশিত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটিতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার নিজের লিখনী শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিত, ভাটপাড়ার খ্যাতাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন ; এক্ষণে তাহারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র একজন জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন ! এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নাই অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুই বছরের শিশু, ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়্‌খড়ির পাখি টানিতে লাগিল, সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত, তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিতমহাশয়েরা নস্যের ডিবা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিনা সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেননা আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "আ মরি আ মরি ! কি বক্তৃতাই করিতেছেন।" এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সে জন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন ?" ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (সংস্কৃত কলেজের ৺হৃষিকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে আমাদের সাধ্য কি অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ

লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" ভাটপাড়ার পণ্ডিত মহাশয়দিগের মতামত এস্থলে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা কলিকাতার পণ্ডিত দিগের অপেক্ষা কোন শাস্ত্রে খাট ছিলেন না। কিন্তু কলিকাতার যে সকল পণ্ডিত বাংলাভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের নবীন ভাষা অবতারণার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্বে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সে কালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।" ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্বাক্য সকল হইয়াছিল, যতদিন না দেবী চৌধুরাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, ততদিন দুর্গেশনন্দিনীরই বিক্রয় বেশি ছিল।

নবপ্রকাশিত সঙ্কল্প মাসিকপত্রে কোন প্রসিদ্ধ লেখক "বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তাঁহার অনুজ ৺তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা) যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন ও চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ১০।১২ জন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্বদাই আসিতেন ; তিনি তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত বন্ধুদিগের যেরূপ আদর সম্মান করিতেন ইঁহাদের সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এবং ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিতমহাশয়েরা

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত শাস্ত্র বিচারে হটিয়া যাইতেন। ভাটপাড়ার এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবরাম সার্বভৌম অষ্টাদশবৎসর বয়ঃক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর ৺হৃষিকেশ শাস্ত্রী যুবাবয়সে শ্লোক রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। একে বি, এ, ডেপুটি, তারপর দেখিতে সুপুরুষ একুশ বছরের যুবা, আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটি আসিলেন; সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, পরে একটি পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন, ইনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে), তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঐ' স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময় ৩।৪ দিন বাটিতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন, যথা।—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপর কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে

এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন 'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে, দরিদ্রঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতট বিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টি ছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনীমূর্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদর্শনে বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।" লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে যশোরে ইহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইহারা প্রধান লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন; ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্বে কি সেই সময় দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতী"তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্ব হিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিশিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোন কোন পুস্তকে শিক্ষানবিশীরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে কিন্তু সে লেখা যে কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোন গৃহস্থের বাটীতে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির এক বিখ্যাত কারিকর নাম কালাচাঁদ

পাল, দুর্গোৎসবে দশভুজার প্রতিমা গড়িত। ষষ্ঠীর দিন রাত্রিকালে বিদেশ হইতে বাটীর কর্তা আসিয়া প্রতিমা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দালানে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে এ প্রতিমা আমি গড়িয়াছি!" কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সে লোকটি বলিল, "আমি কালাচাঁদের ভাইপো।" কর্তা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না তা কখনই হইতে পারে না, এ প্রতিমা কালাচাঁদ গড়িয়াছে!" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, আমি উহাতে খড় জড়াইয়া এক মেটেমো করিয়াছি, আমার খুড়োমশাই দোমেটেমো করিয়াছেন, মুখ গড়িয়া বসাইয়াছেন।" তখন কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া তাহাকে একটি টাকা বখশিস্ দিলেন। আমি সেইরূপ দুই একটি পরিচ্ছেদে এক মেটেমো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দোমেটেমো করিয়াছিলেন। কোন পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম, পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি উপযাচক হইয়া লিখিতাম, কখনও কখনও তিনি ইচ্ছা করিয়াও আমাকে লিখিতে বলিতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লিখিতে লিখিতে নিজের কথা কেন? একটা বিষয়ের কৈফিয়ৎ দিবার জন্যই নিজের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

ভারতীর "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে কৃষ্ণকান্তের উইলের কোন কোন পরিচ্ছেদে আর উহার উইল চুরি পরিচ্ছেদে আমার একটু-আধটু লেখা আছে। এখন বুঝিতেছি, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে পরিচ্ছেদটি সমুদয় আমার লেখা। তজ্জন্য ১৩১৮ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধে ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে রোহিনী কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি তাঁহাকে কখনও এমন কথা বলি নাই, যে ঐ অংশটুকু আমার লেখা। আমি যদি পূর্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। তাঁহার সহিত ঐ আমার প্রথম আলাপ। "উইল চুরি" পরিচ্ছেদে আমার কতটুকু লেখা আছে তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি পরিচ্ছেদে লিখিতেছিলেন, এমন সময় পাঁচটার ট্রেনে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম

ফেলিয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, "কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।" তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোর ক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্যন্ত লিখিয়াছেন,—এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এই স্থানে "রোহিনীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম।" পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিনীর সহিত কৃষ্ণকান্তের আফিমের ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন। আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে "দেমেটেমো" করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে "মাটী" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ literary activity জন্মিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনের বিদায়ের সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিসের কি সাহেব সুভার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই সাহেবের কথা ও অফিসের কাজকর্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক রাত্রিতে কোন ডেপুটির বাড়ী একটা বড় ভোজ ছিল; ডেপুটিতে ডেপুটিতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটি ইহার কিছু পূর্ব্বে লেফটন্যাণ্ট গবর্ণরের সহিত সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই সভাতে আনুপূর্বিক বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন :—

"ধনা এক জনা হয়েছে,
পেথের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে
কথা কয়েছে।"

এই ডেপুটি বাবু বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি তাহাকে এরূপ ভর্ৎসনা করিলেন। একজন ডেপুটি কোনও বিশেষ সরকারী কার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ কার্য তিন বৎসরে শেষ হইবে, কেননা ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য জেলায় জেলায় ঘুরিয়া অনেক বিষয়ের তদন্ত করিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটি বাবুটি ঐ কার্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন ডেপুটি বাবু তাঁহার কার্যদক্ষতা ও কি প্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্যসমাধা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন "ওহে—, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিলে।"

ডেপুটি বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার নিকট বড় ঘেঁসিতেন না। নানাকারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহারা আনুগত্য করিতেন।

দীনবন্ধু কলিকাতার সদর আফিসে আসিলে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র সন্তানকে তিনি চাকুরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন তাঁহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরাণীগিরি, কাহাকেও সব পোষ্টমাষ্টারী যে যাহার যোগ্য তাহাকে তাহাই দিতেন, সেজন্য ওমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন!

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলাম চোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন "দীনবন্ধু বাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।" তিনি আমাদের পরিচিত কিন্তু স্বগ্রামবাসী নহেন, পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে তাঁহার বাস। দীনবন্ধু তখন খেলিতে বসিয়াছিলেন, বলিলেন "একটু বসুন পরে শুনিব।"

গোলামচোর খেলা, পল্লিগ্রামে, কি নগরে, গৃহস্থের বাটীতে কি ধনাঢ্যের বাটীতে সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি প্রকারে সেই সামান্য খেলাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা যদি এস্থলে উল্লেখ করি তাহা হইলে আশা করি পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। আমাদের গ্রামস্থ ৭।৮ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লোক খেলা আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাঁহাকে দীনবন্ধু ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন, কারণ

ইনি সকলকেই গালি দিতেন, কাহাকেও ছাড়িতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ ও আমরা অনেকে দীনবন্ধু এবং সঞ্জীবচন্দ্রের দলভুক্ত হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিঃসহায় ছিলেন এমন নহে, তাঁহারও দলে অনেক লোক ছিল। তন্মধ্যে একটি লোকের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের লইয়া বাটী আসিলে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা এই পরিচয়ে কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই লোকটী ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন, আবার সেইসঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন সর্ব্বদা লিখিবার জন্য 'subject' খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আপনি চুত ফল সম্বন্ধে লিখুন বেশ ভাল 'subject'।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুত ফল কাহাকে বলে ?" সঞ্জীবচন্দ্র বললেন "আম।"

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন। প্রবন্ধটীর প্রথমাংশ আমার মনে আছে, উহা নিম্নে প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি পাঠক মহাশয় রাগ না করেন।

"আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার অতি টক, বাগাতেঁতুলের মত টক, আঁব আঁশাল কোন কোন আঁব আঁশাল হয় না কারণ ভাল গাছের আঁব আঁশাল হয় না—ইত্যাদি।" এই প্রবন্ধটির পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণবাবু গম্ভীরভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, কিন্তু এক ব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তবে আমার প্রবন্ধটি ছাপাইয়া দিন।" বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন সেইখানেই তাহা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম, সেইজন্য উহার প্রথমাংশ আমার স্মরণ আছে।......

খেলা আরম্ভ হইলে দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকেই এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় চোর হয়; কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই একজন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙ্গুর জোড়াটি পায়ে দিয়া

রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গীত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে দীনবন্ধু তখন পূর্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অনেকগুলি বিধবা, নাবালক, নাবালিকা প্রতিপালন করিতে হয়, দিন চলে না, তাহার একমাত্র পুত্র যদি একটা চাকুরী পায় তাহা হইলে অনেকগুলি ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার আফিসে যাইতে বলিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ব্রাহ্মণ পুত্রের পোষ্টআফিসে চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে, কিন্তু খালি কবে হইবে তার ঠিক নাই, একমাস হইতে পারে ছয়মাসও হইতে পারে। ইতিমধ্যে হুগলীর একটি ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার অধীনে রোডশেশ্ ডিপার্টমেণ্টে একটি চাকুরী খালি ছিল, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরী দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু উহাকে সাব পোষ্টমাষ্টারি পদে বহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় স্বরূপ উহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

আমি উপরে বলিয়া গিয়াছি যে নানা প্রকৃতির লোক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতেন। এখানে আর একটি লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইঁহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্ধক্রোশ পূর্বে মাত্রাল গ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাটীতে দোলদুর্গোৎসব হইত। ইনি একজন উপস্থিত কবি ছিলেন। এই কবি সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন সকলেই তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি কখনও আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা।" অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন,—

"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি উদ্ভট প্রশ্ন ? যাহা কখনও

পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে ? আকাশে কখনও কি শেয়াল উঠেছে যে গগনেতে হুয়া হুয়া করে ডাক্‌বে ?”

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভর্ৎসনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটি কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ কবিতার প্রথম দুই চারি পংক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন; “ঘাট হইয়াছে, আপনি অপরাজেয়।” পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম এই, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে ধন্বন্তরি পুত্র সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্বত উপাড়িয়া লইয়া যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে সূর্যদেবকে বগলে পুরিয়া লইয়া পাহাড় মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন ; ঐ পাহাড়ে বাঘ ভল্লুক, পশুগণ বাস করিত তন্মধ্যে শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল ; দারুণ গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিল, আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল,—

“কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।”

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় নীলদর্পণ প্রচারে পাওয়া যায়। এ ত গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্ব্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর নিকট উহা কষ্টকর বোধ হইত। একজন মাতাল টলে টলে খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ষ্টীভার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের ড্রেণে একটি ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি ? উহা

মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল একটা গরু ড্রেণে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম উহা গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেণে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটী নবীন যুবা, পরিপাটি বেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতালবাবু বলিলেন তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুড়ির দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে যাইতে খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নাম ধামেরও পরিচয় দিলেন। তাহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমরা সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন "আপনি অমুকের জামাই।" এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন—"You know my father-in-law sir, then you are my father-in-law, sir, yes sir, son-in-law sir, I sir son-in-law sir,"—এই বুলি ধরিলেন, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেবল তাহার মুখে ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিল কিন্তু শেষ কথাতে "Yes sir son-in-law sir." এই ধুয়া বরাবরই ছিল। পৃথিবীর উপরিস্থ পদার্থের প্রতি মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন স্যার আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা মাতালের প্রতি খানা ডোবার আকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেননা মাতালবাবু যে দিকে খানা কেবল সে দিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্বদিকে সমতলভূমি, সে দিকে কোন মতে টলিবেন না; ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ড্রেণের দিকে দাঁড়াইলাম ও তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিছুদূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেণের দিকে আছি, কোনমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।" তিনি বলিলেন, "না হে না।" তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। আমার তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিম দিকে বৈদিক পাড়ার একটি গলি হইতে দুইটি বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "একি, ইনি কে!"

তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বুক চাপড়াইয়া "Son-in-law sir, son-in-law sir" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটিজুতার, ফটুফটু শব্দ অনেক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম—বৈদিক ঠাকুরেরা 'দাতাল মাতাল'কে বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ মিনিটে আমরা বাটি পৌছিলাম, পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়াছিলেন ততক্ষণ তিনি গম্ভীরভাবে ছিলেন; এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। ঘামিতেছেন, হাঁপাইতেছেন আবার হাসিতেছেন ও হাসাইতেছেন। এখানে বলাবাহুল্য মাতালবাবুকে খাওয়াইয়া পাল্কি করিয়া শ্বশুর-বাটি পাঠান হইল, শ্বশুরবাটি গ্রামান্তরে।

অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি, যাহার পেশা মাতাল হইয়া খানায় পড়া তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকে? সে কেবল দীনবন্ধু। অন্য কোন ভদ্রলোক হইলে উহাকে খানা হইতে তুলিয়া নিকটস্থ কোন দোকানে রাখিয়া (ঐ স্থানে অনেক দোকান ছিল) বাটী চলিয়া যাইতেন, আবার কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেন, কিন্তু দীনবন্ধু অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ রোগ ছিল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোন নাটকে সে চরিত্রটি অঙ্কিত করিতেন। এই মাতাল বাবুই "সধবা একাদশীর" "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইঁহারা দুইজনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গ সমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দন-রোল উঠিল, কেহবা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে বঙ্গদর্শনের যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে বঙ্গদর্শন যখন

বিদায় গ্রহণ করিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায় প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখক-গণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইবে।—

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীন-বন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্য পটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পরিবর্তন হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে "আনন্দমঠের" উৎসর্গ-পত্রে "কুমার-সম্ভব" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলন, "হে ক্ষণভিন্ন সুহৃদ আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে!" বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন দীনবন্ধু "আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু"।—বঙ্কিম-চন্দ্রের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় বঙ্গসাহিত্যের পুনরুদ্দীপন হয়। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত—ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কলম ধরিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ। বঙ্গকুলকামিনীগণও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে দুই চারিজন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতে, কেহ যদি তাহা বিবৃত করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা যে বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সাদরে পঠিত হইত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই কথোপকথনে দেশি ও বিদেশি কাব্য ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা এবং নূতন পুস্তকাদির সমালোচনাও হইত। ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়গণ উপস্থিত থাকিলে চুটকি বিচারও চলিত। আবার এই কথোপকথনের মধ্যে শান্তিপুরের একটা ভূত কিরূপ সমারোহে তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সে গল্পও থাকিত; দীনবন্ধুর গল্প এবং নানাপ্রকার রহস্যের কথাও থাকিত। আমি কখনও এই কথোপকথন বিষয়ে কিছু লিখিবার চেষ্টা করি নাই। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে সময় আমার অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্কিমপ্রসঙ্গ দুই চারিটা প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে।

কথিত আছে যে, প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত লিখিত হয়, প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুই একটা ঘটনা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোন উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই। এ বয়সে সে সব কথার আলোচনায় নিজে তৃপ্তি পাই, তাই লিখি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধু ও পাঠকগণের সে সকল প্রসঙ্গ ভাল লাগিতে পারে, এই জন্য লিখি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাইস্কুল ছিল। টিড নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেডমাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময়, তাঁহার যে একবেলার মধ্যে বর্ণ পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমাদের বাসার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠে স্কুল ছিল। ঐ স্কুল বাটিতেই তাঁহাদের বাসা ছিল। এখন সেখানে স্কুল নাই, সে মাঠে সরকারী বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময় মলেট সাহেব নামে একজন হ্যালুবরি সিভিলিয়ান মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। টিড সাহেবের বিবির সহিত তাঁহার বিবির বিশেষ প্রণয় ছিল। টিড সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদিগকে ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে যাইতেন। মলেট সাহেবের বাটী আমাদের বাসার উত্তরে, মধ্যে কেবল একটি মাত্র উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়া বিবিদের সহিত গল্প করিতেন, ও তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না, সেজন্য কখনও বলিষ্ঠও ছিলেন না।

এইরূপ প্রায় তিন বৎসরকাল বৈকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের বাটিতে যাতায়াত করিতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টেবিল চেয়ার পড়িল, বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠির ভিতর হইতে একজন অপরিচিত সাহেব আসিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকেন নাই। বালক বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন ; পরে আর ঐ কুঠিতে যান নাই টিড সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলেন বটে। ইহার দিন কয়েক পরেই পিতৃদেব কলিকাতার আলিপুরে বদলি হইলেন। এই সময় মলেট সাহেবের সহিত

পিতৃদেবের দেখা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠিতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সাহেব অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিন বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতী পরিবারের সংস্রবে আসায় তাহার কোনও ফল ফলিয়াছিল কি না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।

মেদিনীপুর ত্যাগ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্বের কথা আমার মনে পড়ে। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁঠালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন Session খুলিলে তথায় ভর্তি হইবেন স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল।

কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা কবিতা শিখিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বিস্তর ভদ্রলোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। যেটি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। আর বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত। তখন তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বাটীতে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা আসিত ; উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র সে সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতেন।

একালে যেমন recitation-এর একটি হুজুগ উঠিয়াছে, পুরস্কারের জন্য ছাত্রেরা ঘরে ঘরে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা তেমনিই আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন, তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদবধ "কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম। কতবার উহা পড়িয়াছি তাহার ঠিক নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন আশে-পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত।

একদিন তিনি তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতের" "গোপীভর্তু বিরহবিধুরা কাচিদিন্দুবরাক্ষী" ইত্যাদি শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেকগুলি পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত পরমপূজ্য পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইঁহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি এই পড়িবার ঘরে থাকিতাম,পড়ি না পড়ি একখানি পুস্তক হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সময় সময় ঢুলিতাম, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন প্রতিভাবান ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধহয় স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাংলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়াচণি মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট 'নলোপাখ্যান' ও শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান' আমি প্রথম শুনি। আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি-মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুনা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এক চেষ্টিত হইবেন কেন ? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, কিন্তু বালক দুইটি ভাষা একসঙ্গে শিখিতে পারিবে না এই উত্তরে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্বদা শুনিতাম,—"বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়, সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।" যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ছন্দোবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেন না।। দুর্গেশনন্দিনীর আশমানীর রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার এই মত চিরস্থায়ী ছিল কিনা, জানি না, কেন না তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্তনশীল ছিল, সেই জন্য তাঁর গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হইত। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে 'ইন্দিরা' উপন্যাসটি আবার rewrite করিবেন, এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়দেবের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' কবিতাটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটি তাঁহার মুখে

শুনিতাম ; যখন নিষ্কর্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটি যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি 'আনন্দমঠে' রাখিয়া গিয়াছেন, যথা :—

ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমনবিলম্বনমতি বিধুরা স্নুকুমারী।

আর একটা গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটিতে মাতিয়া ছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন। মাঘ মাসের প্রথমেই এক রাত্রি শেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটি গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম ; গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটি শুনিতে পাইলাম—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।" বৈষ্ণব এই গীতটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুর বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন। পর রাত্রে ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া বৈষ্ণব সেই গীতটিই গাহিল ! এইরূপ কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি গানটি শুনিলেন। ইহার পর অষ্টপ্রহর এই গীতটি তাঁহার মুখে শুনিতাম।

দোলের পূর্বরাত্রে আমাদের ঠাকুর বাড়িতে বড় ধূম হইত, নেড়াপোড়া হইত, অনেক বাজি পুড়িত, রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্তন হইত। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতর লোকের কথাই ছিল না। মেদিনীপুর হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এই দিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে ভালবাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্তি,—কখনও অর্জুনাপুষ্করিণীর ধারে, কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও বা এখানে ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বাড়িতে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া মন্দির মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক

কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র মেয়েপুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশ গোপিনীর ভর্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্বে বাঙ্গলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমায় পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।

এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা, সকলেই সে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত! তাঁহারা জানিতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা, সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেই জন্যই কথাটা আমার স্মরণ আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বন্ধু চূড়ামণি মহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

সেকালের পল্লীগ্রাম মাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটির সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে তো নহে। হুগলি কালেজে ভর্তি হইবার পূর্বে তাঁহাকে একজন **private tutor** সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ-সন্তান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, 'লেখ্‌ লেখ্‌ শূয়াররা' বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিন জন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন, "মারি মারি ? আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ি তাস খেলতে যাও নাই ?" বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময় ঐ কয়জন বালকের সহিত কোন কোন দিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁষিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত। স্কুলে, কালেজে তাঁহার সমধ্যায়ীদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাঙ্গালা

লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গালা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমত সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাততাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটি জুতা পায়ে ফটফট শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুন লইয়া নৈহাটির বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুর বাড়ির দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট নির্জন হইল। সকল বাটির দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ির দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয়-প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটির দরজার নিকট রাস্তার ধীরে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভয়ে পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্বে একবার গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় একদল গোরা আসিতেছে, দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপ দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্ধঘন্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখতে চায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না সাঁতার জানিতেন না, এক জন ভাল Executive officer ছিলেন, তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি পিতৃ-দত্ত একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটিতে কর্মস্থল হইতে বাড়ি আসিয়া, উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, একদল ডাকাত আমাদের বাটিতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটিতে ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা ও আমার চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইব না।" পিসেমহাশয় বলিলেন, "তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।" বঙ্কিম বলিলেন, "কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগদি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।" তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের

বাড়ি পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাঁকা' বলিয়া ডাকিতেন।

আমাদের গ্রামের আর পারে হুগলি কলেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কলেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন রে, নৌকা ছাড়বি ?" মাঝি নৈহাটির পাটনী কখনও 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড় উঠিবার পূর্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌঁছিত, আর কোন কোন দিন মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ সকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কি ভয়ানক দৃশ্য! বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি যাঁড় গরু দেখিয়া ভয় পাইতেন, তিনি প্রকৃতির এই সর্বসংহারিণী মূর্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময় একজন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। দারোগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোনমতে ধরিতে পারিল না, কেন না তাঁহাদের নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি **British-born-subject,** সুতরাং হাইকোর্টে সোপর্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল ; কেন না তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম চরিত্রে এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস এরূপ কুয়াসা চারিদিক ব্যাপিয়া ছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনো ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই ; উহা

প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা কালেজের যাইবার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনর মিনিটে কলেজ ঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় একঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কোথায় কলেজ ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে?" মাঝি বলিল, "আজ্ঞে তা জানি না।" "সে কি রে?" "আজ্ঞে বোধহয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।" মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন জায়গা?" মাঝি বলিল, "বুঝি মূলাযোড়।"

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিংবা যা তা গল্প নহে—সেকালের লোকের নিকট সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একখানি উপন্যাস কোন কোন ঘটনা অথবা কোন কোন গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' প্রবন্ধে কি ঘটনা অবলম্বনে কপালকুণ্ডলা রচিত হইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে আরও দুইখানির কথা লিখিব। আমাদের খুল্লপিতামহ একশত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা, তাঁহাকে আমরা মেজঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেশী গল্প লেখকেরা যেমন নায়ককে মিষ্টার এবং নায়িকাকে মিস লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তেমনি তাঁহার নায়ককে মির্জা এবং নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, অথচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন।

আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধ হয় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' বোধ হয় একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল, তাহা লইয়া স্বামিদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল, যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়। প্রতিদিন তাহাকে দেখিত আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকেও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল' 'অজন্মা' এই সকল কথার সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন।

পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না ; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোঁতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল ; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন।

'বন্দেমাতরম' গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎবাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র 'সাহিত্যে' উহা সবিস্তারে লিখিয়াছেন বটে তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিতমশায় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি 'লোকরহস্যে' প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। 'বন্দেমাতরম' গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আজই পাবে।" একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে 'বন্দেমাতরম' গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে,—উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন।" সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, উহা ভাল কি

মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।" এই গীতটির সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন; পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

চন্দ্রনাথ বসু ॥

যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের 'দ্বিতীয় ভাষা' ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজিওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অনাদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাংলাভাষায় ইংরাজী ধরনের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজি পড়িয়া বাংলায় বহি লেখা কেন! কিন্তু উহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিনকতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষয় নিন্দা রটনা করিতেছে। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল বুঝিবা বঙ্কিম-বাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী' 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল উহা স্কটের আইভান হো পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে আইভান হো' পড়ি নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম, "না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন,— "সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই

লেখা—প্রতিকূল হইলেও এমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে তখন আমি আইভান হো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক হইলাম। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—"ঐ আবার 'কুন্দনন্দিনী' একটা কি বাহির হইতেছে?" তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধ হয় কখনও যাইবে না। 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম উহা পড়িবার পূর্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে-পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম যে, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্রের অর্থ মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরাজিওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান বাটিতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না! মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে নয়। আমরা ত মানুষই নহি, তথাপি ঐ কলেজ রি-ইউনিয়নে যাইতাম ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়, যাইতাম—কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ,

রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কলেজোত্তীর্ণ—আমিও তাহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে এবং আমার বিশ্বাস, যে অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টি বা বন্ধুত্ব বিস্তার আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।

কিন্তু ও সকল কথা এখন থাক। আমি দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের সরকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—"আমি জানিতাম না আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি?" সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্তিমান রাগাদি (tableu vivantes) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ,' তখন বোধহয় চন্দ্রশেখর পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺শ্রীকৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা বঙ্কিমবাবুর দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী সরিষা গ্রাম নিবাসী ৺রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার

সহোদর সদৃশ দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ; কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকিল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনারা কোন মোকদ্দমায় আসিয়াছেন ?' আমি বলিলাম 'আমরা কোন মোকদ্দমায় আসি নাই, আমার নাম—।' 'চন্দ্রবাবু'—এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাসমাদরপূর্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়িতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'পৈতৃক বাড়ি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরনের কতক নব্য ধরনের অট্টালিকা। সদর বাড়ির বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার প্রায় অর্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশাল বপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, 'উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।' আবার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এইভাবে বিভোর—আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্বস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোথায় ? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা, সুন্দর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্যে এবং অপূর্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ ক্ষুদ্র

বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তকপাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম আসিবেন না। রবিবার উকীলদের বাড়িতে মক্কেলের ভীড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।" কাঁটালপাড়ার বাটিতে অনেকবার গিয়াছিলাম, একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীববাবু বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বস। দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন,—"উনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।" এমন সরলভাবে এমন ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—"অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।"

বঙ্কিমবাবু যে সময়ে কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলীতে কর্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমায় বলিয়াছিলেন—'যাইতেছে যাও, কিন্তু ও কাজে থাকিতে পারিবে না।' আমি ছয়মাসমাত্র ডিপুটিগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। অহার দিনকতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণপার্শ্বের বাড়িতে তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানা বাড়ির পর একটি বাড়ি তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর বাটির পূর্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্মিত। উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত

হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন—'সন্ধ্যার পর আমরা এখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনারগুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়িতে তিনটি ঘর ছিল; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন, আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবারে সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটি দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমায় দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকটে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম, না দেখিয়া বলিলেন,—'এস।' আমি বলিলাম—'যাব কিনা তাই ভাবছি।' যাইবামাত্র হাসি, আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব।

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহার কাছে কখন খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরে নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখন আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়। শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমিও অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার মাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন,—'বঙ্কিমবাবু কি বন্ধুবৎসল!' একবার সন্ধ্যার কিছু পরেই পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন, আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখ হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলে ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না থাকিলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল সন্ধ্যা আগত প্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ

জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব কমনীয়তা মিশ্রিত অসীম প্রতিভা ও পুরুষব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্তি! স্ফূর্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন,—এই রকমই ত চাই।

সাহিত্যের সংস্রবমাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার অফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুইখানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমবাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন?' তিনি বলিলেন—'দুই তিন ঘণ্টা হইবে।' সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট যুবক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ স্থির ধীর প্রফুল্লভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, যুবকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলে উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালার প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়িতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমায় বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।' বঙ্কিমবাবুর যোড়াঘাটের বাড়িতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধুস্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ি নৈহাটিতে। তিনি সর্বদাই গঙ্গাপার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত দেখিতাম,

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটির দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়িতে যাইতাম। নানাশাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর প্রকৃতি, বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন তেমনই ভক্তি করিতেন। তাঁর মৃত্যুর দিন বঙ্কিম বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কলিকাতায় থাকিলে তিনি, তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবি হেমচন্দ্র, কোমৎমতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সর্বদাই সেখানে থাকিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমদাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।

তখন অপরাহ্ন পাঁচটা। সান্ধ্য রবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়ার কলেজের, হুগলীর ইমামবাড়ির এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। অর্ধ গঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল এবং অপরার্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোল, রাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল

"হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে।"

কল্পনার চক্ষে ভাগিরথীর যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চর্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগিরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দুজনেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম,—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঞ্চল ও।"

গাইতে গাইতে নৌকা নৌহাটির ঘাটে পঁহুছিল এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাওঠা হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই বলিয়া, আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিম বাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগানো একটি হল, এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারিদিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসনওয়ালা চেয়ার, ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়ম; আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র ও

নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল। নাসিকা উন্নত, অবরোধ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখ ও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি; দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি লোকটি কে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে?" আমি হাসিয়া বলিলাম "বঙ্কিমবাবু।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?' আমি হাসিয়া কহিলাম —"শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?" আমি বলিলেন—"পড়িবার কথা নয় কি?" আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন—"দেখা যাক কার জিৎ হয়।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"ছোকরাদের চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ, আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই।" সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।" আমি অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দাদা শুনিলেন কি? এঁর মুখে আমার ইংরাজির প্রশংসা! তাঁর সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারও যোগ্য নই।" অক্ষয়বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"বটে! অক্ষয় আপনার দাদা অক্ষয় আমার নাতি এবং অসাধারণী আমার নাত-বৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলে মানুষকে আর আপনি বলা যায় না।" অক্ষয়বাবুর কাগজের নাম সাধারণী তাই বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্ত্রী নাম রাখিয়াছিলেন 'অসাধারণী।' ইহার পর অনেক গল্প চলিল। সঞ্জীবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"বঙ্কিম! তুমি এঁর কবিতার ও ইংরাজির প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমি এঁর কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। এঁর বাড়ী চাটগাঁ বলিতেছেন।" অথচ কথায় বাঙ্গাল দেশের গন্ধমাত্র নাই, ঠিক আমাদের মত বলিতেছেন।" তখন আমার কথার, চট্টগ্রামের ভাষার পূর্ববঙ্গের ভাষার একটি সমালোচনা হইল। তাহার পর বঙ্গসাহিত্যের কথা

'পলাশী যুদ্ধ' 'বৃত্রসংহার' ইত্যাদির কথা, 'বঙ্গদর্শনে' উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে?" আমি বলিলাম—"আমি হেমবাবুর শিষ্য স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে?" অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন—"মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।" বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে, আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে দুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিন জন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমবাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটা কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই বড় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ।' তিনি—"কোনস্থান পড়িব?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া, যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"বিষবৃক্ষ" আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।" আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে, তিনিই সূর্যমুখী। তখন বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণবাবু আসিলেন। আমি 'মৃণালিনী' গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণবাবু হারমোনিয়মের সঙ্গে তাহার দুই একটি গান গাহিলেন। কাণে যেন অমৃতবর্ষণ করিল।

তাহার পর আমরা তাঁহার বাড়ির ভিতর উপরের বারাণ্ডায় গিয়া খাইতে বসিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বামুনবাড়ির রান্না মাছ মাংস তুমি খাইতে পারিবে না; নিরামিষ তরকারি যাহা আছে, তাহাতে দুই এক গ্রাস খাইতে পার কিনা দেখ! আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু মাংস একটুক মুখে

দিয়াই বুঝিলাম যে বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার মত তাঁহার এ সমালোচনাও বঙ্গদর্শনের উপযুক্ত। মাংসে পেঁয়াজ মসলা কিছুই নাই। যেন খালি খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তথাপি শিষ্টাচারের অনুরোধে বলিলাম—"কেন মাংস ত বেশ হইয়াছে ?" তিনি বলিলেন—"তোমার ঠানদিদির খোসামুদি করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের রান্না খাইয়াছি। আমাদের এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা মাছ মাংস তেমন রাঁধিতে পারে না। খাওয়ার পর বৈঠকখানায় আসিয়া তিনি অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাদেব সঙ্গে গল্প করিলেন এবং আমাদিগকে শোয়াইয়া নিজে শুইতে গেলেন। পরদিন প্রাতে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। 'বঙ্গদর্শন' অল্পদিন পূর্বে বঙ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায় 'গলা টিপিয়া মাবিয়াছিলেন।' উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আব একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বঙ্গদর্শনের সহিত আর্যদর্শনেব বঙ্গসাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। এতএব চুঁচুড়ায় অক্ষয়বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচার প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বটে! 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব ? আমি একে ত দাসত্ব ভারে পীড়িত, তাহাব উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রম শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রায় তিনভাগ লিখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি, কোন কোন গ্রন্থকার আমায় মারিতে পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলের পর বোধহয়, আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell)। তোমরা বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমি তার সম্পাদক হইব না।" আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম ; কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তিনি অক্ষয় কি সঞ্জীববাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন সমস্ত দিনটা তর্কে-বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয়বাবু বলিলেন, তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কার্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীববাবু কার্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন।

তখন অক্ষয়বাবু মাসিক দুই শত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—এত বেতন চলিবে না, কারণ, বঙ্গদর্শনের দুইশত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং এ ভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কথনও বঙ্গদর্শনে লিখিতে দিবে না বল।" আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম—"আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত ?" তিনি বলিয়াছেন—'বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।" অক্ষয়বাবু বলিলেন চাটুয্যেদের অহংকাব দেশে একটা প্রবাদের মতো দাঁড়াইতেছে।" আমিও হাসিতে হাসিতে বর্ধমানে সঞ্জীববাবু সম্বন্ধে সে ধারণার কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহংকারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটা গল্প শুন। বহরমপুবে বদলি হইয়া গেলাম। একে ত রোডসেস ইত্যাদি একরাশি কার্যের ভার কলেক্টর বেটা জিদ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমাব ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে সে যে হুঁকা লইয়া বসে অবে উঠে না। আমি দেখিলাম, আমার লেখাপড়া বন্ধ হইল। তখন আমাব গৃহদ্বারে এক নোটিশ দিলাম যে, কেহ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তাব পবদিন হইতে সমস্ত বহরমপুরে রাষ্ট্র হইল—বটে! বেটার এমন দেমাক থাক, তাব বাড়িব আশে পাশে কেহ যাইব না। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম! দ্বিতীয় গল্পটি এরূপ। এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসেব সমালোচনা হইতেছিল। এক গুলিখোর বলিল—"বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর। তাহা না হইলে বাবা এমন রসিকতা কি তার কলম হইতে বাহির হয় ?" সকলেই হাসিলাম। বুঝিলাম এই শেষ গল্পটা অক্ষয়বাবুর উপকারার্থ। অক্ষয়বাবু বলিলেন—"আমি গুলিখোর হই আর যা হই, কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশটা যে টলটলায়মান, তাহা আমি একশবার বলিব।"

এবার কি ইহার পরের বারের সাক্ষাতে, ঠিক স্মরণ নাই, অহঙ্কারের একটা ঘটনা আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল। আমরা প্রাতে বসিয়া আছি, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলি গায়ে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি একটা চরের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি যেন শিমূলস্তূপে অগ্নি পড়িল, তিনি ফরসির নলটি মুখ হইতে নামাইয়া সক্রোধে বলিলেন—"বটে! তুমি এজন্য আসিয়াছ! বের হও।" ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন—"দেখিলে তামাসা?" আমি বলিলাম—"কাহার? আপনার না ব্রাহ্মণটির?" তিনি বলিলেন—"আমার কেন? ভদ্রলোক আসিল, আত্মীয় বলিয়া আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তারপর তার ব্যবহারটা দেখিলে? সে কেন আফিসের কথা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল?" আমি বলিলাম, "তাহার জন্য তাহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়া, মিষ্টভাবে বলিলেই হইত—আপনি আফিসে গিয়া তাহার খবর লইবেন।" তিনি বলিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ জান না; এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার না করিলে, বাড়ির কাছে হুগলীতে আমার কাজ করা চলিবে না।"

যাহা হউক তাঁহার ভীষ্মবাক্যে আমরা সম্মত হইলাম যে, শিবনাথ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখিতে পারিবেন না। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, আর্যদর্শনে'র সম্পাদক বিদ্যাভূষণ ও 'বান্ধবে'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে এই 'বঙ্গদর্শনে' যোগ দেওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বেশ সুন্দর চলিবে। 'আর্যদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল, 'বান্ধব'ও সাময়িক অবস্থা ত্যাগ করিয়া অসাময়িক হইয়াছিল। তাহার পরে বন্ধ হয়। কিন্তু স্মরণ হয় তাঁহারা উভয়ে লিখিলেন যে তাঁহাদের দেনার ভার যদি 'বঙ্গদর্শনে'র অধ্যক্ষ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁহাদের এবং সঞ্জীববাবুর তিনজনের সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচারিত করিব। তাহা হইল না উহা কেবল সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় পুনঃপ্রচারিত হইবার স্থির হইল। তদনুসারে হইয়াও ছিল। কিছুদিন পরে চন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক হন। কিন্তু কোথায় সূর্য ও কোথায় জোনাকি। কিছুকাল অর্ধমৃত অবস্থায় চলিয়া 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হইল।

আরও একটি দিন এরূপে বড় আনন্দে কাটিল। পরদিন আমি সকালের ট্রেনে কলিকাতায় যাইব এবং অক্ষয়বাবু হুগলী যাইবেন কিন্তু বঙ্কিমবাবু আর

বাড়ির মধ্য হইতে আসেন না। তিনি পূর্বরাত্রিতে আরও একটা দিন তাঁহার বাটিতে থাকিবার জন্য বড়ই জিদ করিয়াছিন। আমার সন্দেহ হইতেছিল যে তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার ট্রেণ মিস করাইবার জন্য দেরি করিতেছিলেন। অক্ষয়-বাবুরও সে সন্দেহ হইল। অবশেষে আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আবার থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমি আবার অসম্মত হইলে কলিকাতা যাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখাইলে, তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন এবং চা আনিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, আর এক ষড়যন্ত্র। বলিলাম—আমি চা খাই না। তিনি বলিলেন যে তখনও ট্রেণের ঢের সময় আছে, দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেও তাঁহার বাড়ি হইতে গিয়া ট্রেণ পাওয়া যায়। নিতান্ত আমি চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া, হলের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া, আমার সঙ্গে করমর্দন করিয়া বিদায় দিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা মনে হইয়াছে। তোমাকে ত আমার বহি একসেট দিই নাই।" চাকরকে বহি একসেট শীঘ্র আনিতে বলিলেন এবং কিছুতেই আমাকে আসিতে দিলেন না। আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বহি আসিলে বলিলেন যে, প্রত্যেক বহিতে তাঁহার হাতের উপহার লিখিয়া তবে ত দিবেন? আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার, আমার ট্রেণটা মিস করাইবেন না।" তখন বলিলেন—"অন্তত 'বিষবৃক্ষটা'য় লিখিয়া দি।" এবং বড় কায়দা করিয়া ধীরে ধীরে লিখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ঠন করিয়া নৈহাটি ষ্টেশনে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। আমি বহিগুলি কুড়াইয়া লইয়া সটান দৌড় দিলাম। গাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় গিয়া ট্রেণের এক কক্ষে লাফাইয়া উঠিলাম। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া ট্রেণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মনে করিয়াছেন—আমি ট্রেণ মিস করিয়াছি। কিন্তু আমাকে ট্রেণে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আমিও তাই করিলাম। ট্রেণ তাঁহার গবাক্ষপথ ছাড়িয়া আসিলে পর আমার জীবনের একটি সুখস্বপ্ন ভোর হইল। এ আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া গাড়িতে বসিয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম—এই স্নেহবান সুরসিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি লোকের কাছে ঘোরতর অহংকারী বলিয়া পরিচিত?

তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনও মনে পড়ে; দুর্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্যায়ে আনন্দময় পর্বাহের মত আমার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি; তাঁহার কথা শুনি, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেইদিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্নী—তখনকার মুন্নী—এখনকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এস—রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিমবাবুর দরবারে আমাদের আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। 'মুন্নী' তখন সাহিত্যে আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর কয়েকজন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও সহানুভূতি এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই একজন বলিলেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই! বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।" আর একজন বলিলেন, "তোমরা নব্য ছোকরা বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাঙ্গামে দরকার কি?" একজন বলিলেন "বঙ্কিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।" বুঝিলাম, সই সুপারিস পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার বয়স নয়। "সাহিত্য" ভিন্ন অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্নী পরামর্শ করিলাম, যখন "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে" ঘটিল না, তখন একদিন 'One fine morne' আমরা দুইজনে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই One fine morne-এর একটু ইতিহাস না বলিলে আপনারা এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয় এবং পত্রে ও কবিতায় সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়-আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি তখন লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসিতে লিখিতাম। তিনিও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন, One fine morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই One fine moren-এর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই One fine morne আর আসিল না। কোন কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোন কাজ করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার One fine morne-এর পর্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বঙ্কিমবাবুর নিকট যাইবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য, উহাকেও আমরা সেই One fine morne-এর তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম।

আমি একদিন মুন্নীকে বলিলাম, "চল বঙ্কিমবাবুর কাছে যাই।" মুন্নী বলিল "গলা ধাক্কা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "ষটকর্ণ হইলে মন্ত্রভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া মোট চারি কর্ণ তাহাতে সে ভয় নাই। গলা ধাক্কা দুজনে ভাগ করিয়া লইব। কেহ প্রকাশ করিব না। চল।"

তৎক্ষণাৎ 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' ও সাহিত্যে'র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহাকে অদৃপ্ত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা না বলিলে, যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা ফুটিবে না। এই জন্যই বাজে কথার গৌরচন্দ্রিকায় এত বাজেতম কথা লিখিতে হইল। পরে যাহা লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গম্ভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পারে কিন্তু চরিত্র চিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে যাত্রা করি।

তখন বঙ্কিমবাবু মেডিকেল কলেজের সম্মুখবর্তী প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে বাস করিতেন। বাড়িখানি সাধাসিধে। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরি বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্বাস্য হইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে দ্বারের পার্শ্বেই জলের কল। সেই জলে বঙ্কিমবাবুর খানসামা হুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন?" ভৃত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কি দরকার?" আমি চটিয়া লাল। বলিলাম, "বঙ্কিমবাবুর কাছে কি দরকার তা তোকে বলিব কিরে! তাহা হইল তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর—তুই খবর দে!"

মুন্নী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "কর কি তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাদা! চুপ্ চুপ! ইত্যাদি।

বঙ্কিমবাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় শুনিলাম, উপর হইতে কে বলিতেছেন,—"আপনারা উপরে আসুন।"

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক "শালপ্রাংশু মহাভুজ" গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা হুকা—তামাক খাইতেছিলেন—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার ললাটে তখন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কীর্তিকুসুমের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলাসন নয়,—মার আশীর্বাদ। খানসামা বলিল,—"বাবু"!

এই বঙ্কিমচন্দ্র! বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদুকর বঙ্কিম, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্কিম! হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" উপর হইতে তাঁহার ভৃত্যের সহিত আমার অবিনয়—কলহ বঙ্কিমবাবু দেখিয়াছেন! কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না।

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজের উপর সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েল-পেন্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কৌচ কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি টেবিল হারমোনিয়ম। বঙ্কিম-বাবুর গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাতকাটা জামা। ধুতিখানি কোঁচানো। পায়ে চটি। পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন।

আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"থাক থাক"।

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল বলিতে পারিলাম না। ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্তের উপর আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও কোন লাভ নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখিবার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহার পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোরে ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় আর তেমন নাই। এখন ভক্তি হয়ত আরও গাঢ় আরও সংহত এবং কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামির গন্ধে ভরপূর এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না, এক ভক্তি শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই, যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা মহান হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে কিন্তু অন্ধ ভক্তির তালকাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে যে দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিন্ধবাদের স্কন্ধবিহারী চূড়ার মত এই নাটুকে সাহিত্যভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা ত সুখী হইতে পারি না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বসুন"। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বঙ্কিমবাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক "ন যযৌ ন তস্থৌ!" বঙ্কিমবাবু অঙ্গুলি নির্দেশে একখানি কৌচ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম, —"আপনি দাঁড়াইয়া"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার বাড়ি, আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।" আমি বলিলাম, "আমাদের 'আপনি' বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়"। বঙ্কিমবাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, বসো"।

আমরা সেই কৌচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল; বঙ্কিমবাবু বাঘ নন, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া কথা কন; গলাধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে!

আমাদিগকে নীরব দেখিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমাদের দু'জনকেই আমি জানি। তুমি 'ত্র' বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র? তোমার নাম সুরেশ নয়?"

আমি বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া বঙ্কিমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তোমার আশ্চর্য মনে হইতেছে? সেদিন দীনবন্ধুর পৌত্রীর বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মজলিস করিতেছিলে। আমাদের হেম করের ছেলে পণ্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখলুম্ তুমিই জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, তুমি বিদ্যাসাগরের নাতী, তোমার নাম সুরেশ। পরে বঙ্কিমকে বল্লুম, তোমাকে ডাকতে। বঙ্কিম যাচ্ছিলেন—আমি আবার বললুম,—"ওরা আমোদ করছে—করুক, ডেকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে? এখান থেকেই ওদের হাসি তামাসা দেখি।"

দীনবন্ধু সেই দীনের বন্ধু, নীলকরের যম, বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর; শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—এখন বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্ত্তমানে সুকবি ও দার্শনিক, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ। পণ্টু—পি, সি, কর ওরফে প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী, অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। হেমবাবুও ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবুর সমকর্মী।

তাহার পর মুন্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমাকেও আমি জানি। তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ। তুমি যেবার বি, এ, দাও সেবার আমিও ইউনিভার্সিটি হলে গিয়েছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া বাবড়ী চুল, এত অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছ দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ছেলেটি কে হে? খুব অল্পবয়সে বি, এ, দিচ্ছে তো? চেনো? ত্রৈলোক্য বললে—ঘনশ্যামের ছেলে।" তোমার ডাকনাম মুন্নী? ভাল নাম কি?"

মুন্নী বলল, "জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তুমি কি কচ্ছ?"

মুন্নী বলিল, "আমি এম, এ, দিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ও আবার এম, এ, দেবে বলে পড়ছে। আমরা বলছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান হবার চেষ্টা কর।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন "ওর বাবা কি বলেন ?"

আমি বলিলাম, "তাঁর অমত নাই।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তবে আবার এম, এ, কেন ?"

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে কি ?" আমি অবসর পাইয়া কম্পিত হস্তে সেই "সাহিত্য কল্পদ্রুম" ওকল্পদ্রুম-কাটা "সাহিত্য" বঙ্কিমবাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দাও, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখতে বলো না।"

গলা-ধাক্কা বটে। কিন্তু কি সুন্দর, কি মিষ্ট প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া, সুবুদ্ধির মত তখনই বলিলাম, "যে আজ্ঞে!"

দুজনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্যসাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিমবাবু "সাহিত্য" সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি। বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন, তোমার দাদা ম'শায় জানেন ?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদামশায় জানেন কি না তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ভাবি জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অনধিকার চর্চা করিতে দিতেন না। বাড়িতেই আফিস ছিল। লুকাইবার জিনিষ নয়, হয়ত শুনিয়া থাকিবেন, বারণ করেন নাই।

মুন্নী বলিল, "বোধ হয় তিনি জানেন।"

বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি ? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে কাগজ বার করে ফেল্লে। তিনি শুনলে রাগ করবেন না ?"

আমি বলিলাম, "বোধহয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "দেখ লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্যে ত কিছু করা চাই।

এতে উপার্জনের আশা নাই। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এ সব কাজ করেছি। এই চাকরী করতে করতে লেখার জন্যে ছুটি নিয়ে এখন ভুগছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো,—আর ভাল লাগে না, শরীরেও বয় না কিন্তু সেই ছুটিগুলো এখন পুষিয়ে দিতে

বঙ্কিমবাবু তখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই।—আমি নিরুত্তর। মুন্নী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল "বিদ্যাসাগর মহাশয় ওদের দুভাইকে স্কুলে দেননি। বাড়িতে পড়ান।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কেন? তাঁর নিজের স্কুল-কলেজ রয়েছে, নাতিদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?" মুন্নী বলিল, তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরেজী পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়িতে পড়ে। তিনি বলেন ভাল করে পড়াশুনা করে ওরা বাঙ্গলা লিখবে। তিনি নিজে সময় পাননি, যা সাধছিল, লিখতে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তবে ভাল।"

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি লিখিতে পারিব না কিন্তু তোমাদের যখন যা দরকার হবে জেনে যেও; আমি অনেকদিন বঙ্গদর্শন চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারি পর্যন্ত।"

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিমবাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। "সাহিত্য"র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্নী বলিল, "একেবারে যে আজ্ঞে বলে ফেল্লে? এদিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পারলে না?"

আমি বলিলাম, "তুমিই কোন পারলে?"

সেই দিন হইতে তিন দিন তিনরাত্রি বঙ্কিমবাবুর Warning-এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা দারিদ্র্য বিফলতা—নানা শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুদিকে দুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম,—"যে কাজের সূত্রপাতেই বঙ্কিমবাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।"

বাগান হইতে বেল জুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাসিত উদ্যানের সৌম্য শ্যাম শ্রী আমার কল্পকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা আশার যবনিকায় আমার অক্ষমতা, বিফলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধুলায় লুটাইয়াছে—কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ, তাঁহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম।

আমাদের যৌবনের পিতামহ ভীষ্মকে **My dear friend** বলিবার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সমকক্ষভাবে ভিজিট দিবার রীতি ছিল না। এইজন্য একটা উপলক্ষ না জুটিলে বঙ্কিমবাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটিত। "সাহিত্য" বাহির হইলে বঙ্কিমবাবুর জন্য লইয়া যাইতাম। বঙ্কিমবাবু প্রথমেই লেখক ও লেখিকার নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

'সাহিত্যে' 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে অনেকগুলি সনেট ছাপা হইয়াছিল। কবি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকের উপর এক একটি সনেট লিখিয়াছিলেন; সনেটগুলির নিচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাই। বঙ্কিমবাবু সে দিন পূর্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"এস ভাল ত?" আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র আমার বেশ লাগিয়াছে। তুমি ত বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা ত আগে আমায় বল নাই?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি লিখি নাই।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "উহাতে নাম নাই দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম,—সম্পাদকের লেখা; না তুমি লজ্জা করিতেছ?"

আমি সেই কবিতাগুলির লেখক হইলে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। সে সৌভাগ্য না হউক, আমি সনেটগুলি বঙ্কিমবাবুর ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া একটু গর্বের একটু গৌরবের সুখভোগ করিতেছিলাম। কারণ

যাঁহার লেখা তাঁহার গৌরবে আমারও আনন্দিত হইবার কথা ছিল। প্রথম জীবনে পরিবারের বাহিরে আমরা যে বৃহত্তর পরিবারের রচনা করি, লেখিকা সেই পরিবারের একজন ছিলেন, আমাকে দাদা বলিতেন।

বঙ্কিমবাবু আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে লিখিয়াছেন ?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "পুঁটির লেখা।"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পুঁটি ? পুঁটি কে ?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "সরোজকুমারী দেবীর লেখা, বাড়িতে পুঁটি বলিয়া ডাকে,—মুন্নীর বোন।"

বঙ্কিমবাবু।—"ঘনশ্যামের মেয়ে।"

আমি। "না মথুর বাবুর মেয়ে ?"

"তুমি পুঁটি বলে ডাকো, তাহলে তোমাদেরচেয়ে ছোট ?"

আমি।—"আজ্ঞে হাঁ—চৌদ্দ পনর বছরের বেশি বয়স নয়।"

বঙ্কিমবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "বেশ ক্ষমতা আছে, রীতিমত চর্চা রাখলে—ভবিষ্যতে ভাল হবে। তুমি তাকে বলো, আমার খুব ভালো লেগেছে।

আমি আবার একটি "আজ্ঞে" বাহির করিলাম। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, "আমার বইগুলি এত ভাল করে পড়েছে; আমার উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমার আনন্দ হবে এ কিছু বেশি কথা নয়; আমার নিজের কথা এমন করে কেউ লিখলে, খারাপ হলেও হয়ত ভাল লাগত, কি বল ? সে জন্য ত আমার আহ্লাদ হবেই, আর তা বলতেই বা দোষ কি ? কিন্তু আমি সেকথা বলছি না, সত্যই, এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে, কবিতাগুলি বেশ হয়েছে; তুমি তোমাদের পুঁটিকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্বাদ জানিও।"

আমি বলিলাম, "বলিব। পুঁটি শুনলে খুব খুসি হবে। সেদিন বিহারীবাবুও কবিতাগুলির প্রশংসা কচ্ছিলেন।"

বঙ্কিমবাবু, "বলিলেন—"কোন বিহারীবাবু ?"

আমি বলিলাম, "সারদা-মঙ্গলের বিহারী চক্রবর্তী।"

বঙ্কিমবাবু, "তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ? তিনি কি করেন।"

আমি যাহা জানিতাম, বলিলাম। বিহারীবাবু পৌরহিত্য করিতেন, এ প্রশ্নের উত্তরে উহাই বলিতে হয়, তাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু "সারদামঙ্গলে"র কবি সংসারে কিছুই করিতেন না। তিনি করিতেন, সাহিত্যের পৌরহিত্য। গুরুদেব হইবার রীতিমতো বন্দোবস্ত ও সরঞ্জামও ছিলনা; ধনী ছিলেন না,—অভাবও ছিলনা; সৌভাগ্যক্রমে স্বল্পে সন্তুষ্ট ও তাঁহার গুরু বিদ্যাসাগরের মত "স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা" ছিলেন। যজমান প্রতিপালন করিয়া মঠ গড়িয়া ভক্তিশ্রদ্ধার ব্যাপারের জন্য আড়ম্বরও করেন নাই। তাঁহার নিমতলার বাড়ির নীচের ভাজা-ঘরে দুই চারিজন যজমানের সমাগম হইত। তিনি সাহিত্যে মসগুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্যরসের যজমানের মধ্যে সে সময় প্রধান ছিলেন, সাহিত্য-রসিক প্রিয়নাথ সেন ও কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। চক্রবর্তী মহাশয় তক্তপোষ বাজাইতেন। সে তক্তপোষে একখানা মাদুরও ছিলনা। তার নিজের কথাবার্তায়, আচারে, ব্যবহারে, মন্তব্যে 'হোকগে এ বসুমতী যার খুসি তার', এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেন। বেহারীবাবু বঙ্কিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, বেহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি, বঙ্কিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক—কিছু শুনিব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটি গল্প শুনিয়া বলিলেন, "জীবনেও poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত!"

আর একদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম। সে দিন বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে উত্তরদিকে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুই-তিনখানি চেয়ার। পশ্চিমে দুইটি আলমারী। উত্তর ও দক্ষিণের জানালা উন্মুক্ত। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। একটি ছোট গড়গড়া তাহাতে দীর্ঘ কাঠের নল। দেখিলাম, সচরাচর লোকে নলের যে দিকটা গুড়গুড়িতে লাগায়, বঙ্কিমবাবু সেই দিকটাতেই তামাক খাইতেছেন। অপর দিকটা গড়গড়ার রন্ধ্রমুখে সন্নিবিষ্ট। আমি মনে করিলাম, বুঝি ভুলিয়া উল্টো দিকটা মুখে দিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নয়, নলটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। আবার মুখে দিবার সময় উল্টাদিকটাই মুখে দিলেন।

বঙ্কিমবাবুর টেবিলে চায়ের পেয়ালা ছিল। বঙ্কিমবাবু পেয়ালাটি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চা খাবে?"

আমি বলিলাম, "থাক,—আপনার চা ত হইয়া গিয়াছে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "খাও ত?—মুরলী!"

মুরলীধর হাজির হইল! বঙ্কিমবাবু আমার জন্য চা আনিতে বলিলেন।

মুরলী বঙ্কিমবাবুর সেই খানসামা।—প্রথম দর্শনেই যাহার সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছিল। পরে তাহার সহিত আমার আপোষ হইয়াঃগিয়াছিল; মুরলীর সঙ্গে আমার একটু প্রেমও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরে উকীল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ছিল। মুরলী আর ইহলোকে নাই,—বোধহয় আবার বঙ্কিমবাবুর তামাক সাজিতেছে, যদি নরক হইতে স্বর্গ পর্যন্ত ট্রাম হইয়া থাকে, এবং যমদূতকে সাধিয়া ছুটি পাই, তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন মুরলী দ্বার ছাড়িয়া দিবে, হাসি মুখে 'আসুন' বলিবে, এবং লুকাইয়া তামাক সাজিয়া দিবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এদিকে বড় উদাসীন। তোমাদের সাহিত্যেও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল-বদল করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন?"

আমি বলিলাম, "আমরা পারি না; জানি না। আপনা আপনির লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐরকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহস হয় না।"

বঙ্কিবাবু।—"তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই জন্যই বঙ্গদর্শনের আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া 'রিভাইজ' না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত, চন্দ্র একেবারে বাংলা অক্ষরে ইংরাজী লিখেছিলেন। খুব খাটতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এ জন্যে কেউ ত রাগ করতেন না—তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরাজী গন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের আলাদা কথা।"

বঙ্কিমবাবু।—"ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও না। এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায়। আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা পাকে তা জান?"

আমি—"আমরা পারিব কেন ?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরাও কর। আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারও লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিই নি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা লিখতেন। দিব্যি ঝরঝরে বাঙ্গলা। জানতুম তাঁর লেখা থেকে একটু কেটেকুটে দিলেই যথেষ্ট হবে।"

* * * *

বঙ্কিমবাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গলার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির গবেষণার, রচনার, মধুর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, দুই একবার সেই প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রুর উদগমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষুদ্র "বাঙ্গলার ইতিহাস" বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম "বিধিদত্ত ধন"। তাঁহার নানা প্রবন্ধ বাঙ্গালী এখন পড়েন কি না জানি না। কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া 'বাঙ্গালী' বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙ্গলার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এই সকল পুণ্যশ্লোককে কখনও না ভুলি। বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ নাই কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র ; অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্বগামীদের বহু সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

এই দিন বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ দেন ? আপনার লেখায় কোথাও কোথাও এইরকম দেখিতে পাই ; সর্বত্র নয়।"

বঙ্কিমবাবু আপনার দক্ষিণ কর্ণে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী স্থাপন করিয়া বলিলেন, —"কান। আমার প্রমাণ—কান। যা কানে ভাল লাগে, তাই লিখি এত নিয়ম মানিতে গেলে চলে না।" আমরা আজ কাল এই নিয়মেই চলিতেছি। সর্বত্র কানই আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে ; কবিতায় ত কথাই নাই ; তবে তাহা সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কানের জন্য রচনা হয়, কান পর্যন্তই যাহার গতি,

কানেই তাহার স্থিতি এবং কানেই যাহার পরম পরিণতি বা জীবনমুক্তি তাহা প্রমাণের জন্য কান ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটি কথা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, আমাদের কানে সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কানের অপেক্ষা একটু 'দীর্ঘ'। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে এই কয়টা কথা বলিবার জন্য এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।

১২৯৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্নী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্যসভা ছিল। মুন্নী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্রেরা তাহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাঁহাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের রচনার অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদের রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্তত সভ্যদের ব্যবহারের জন্য, কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্নী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতিলাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পরদিন প্রভাতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। সেদিন তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মুন্নীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের মোক্ষমূলারের উৎকণ্ঠোরণের মনীষী ও সাহিত্যরসিক ছাত্র-সম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আস্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবু আনন্দিত

হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনও ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, সম্মতিও দিলেন না। আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, "কেন ?"

বঙ্কিমবাবু গড়গড়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "মুন্নীরা আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে ;— হয় ত বিদেশী সহপাঠিদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি ?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজী করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছিলাম, না ছাপাই ভাল।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন ?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publisherদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে রমেশ লিখিলেন, Publisherরা নিজের খরচে বাঙ্গালা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন Problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অন্য উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবে না। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠিপত্র চলিয়াছিল।"

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি। উভয়ে মসগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—"মুন্নীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি যে রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "তোমার যে বড় আগ্রহ! তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন, শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই ছাপিব। তোমাকে বলি—আমার দুই একখানা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমার পছন্দ হয় নাই। আমি নিজে অনুবাদ করিব, ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই উহাদের অনুবাদ করিব —ভাবিয়াছিলাম! এই দেখ—"

বঙ্কিমবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন; ঘরের পশ্চিমদিকে একটি আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন; আলমারী খুলিয়া সকলকার উপরের তাক হইতে একখানি বড় বাঁধান খাতা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, দেবীচৌধুরাণীর অনুবাদ।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "দেখ, কত খাটিয়াছি। অনুবাদ করিয়াছি। কাটিয়া কুটিয়া আবার 'কেয়ার' করিয়াছি। তাহার পর বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছি।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "তবে এইখানিই দিন!"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আমি বিলাতি **Publisher** দের কাছ থেকে **estimate** পর্যন্ত আনাইয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম ছাপাইয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম "সে কি? অক্সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রদের ভাল লাগিল, ইংরেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না?"

বঙ্কিমবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আমার হাত হইতে দেবী চৌধুরাণীর পাণ্ডুলিপির খাতাখানি লইয়া পাতা উন্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবু একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি তখনই সুযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া, আব্দার করিয়া বলিলাম, "একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভাল লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয়; তাহারা গালাগালি দিবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "গালাগালি দিবে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? **Poligamy** বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশও ত 'বহুবিবাহ' দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।"

আমি তবু বিরক্ত হইলাম না, সাহস করিয়া বলিলাম, "তাহা ত পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমাদের আব্দার রাখিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম।

কিন্তু আমি এখন ইংরাজীতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।"

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং দুলীকে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। **Private Circulalion**-এর জন্য ছাপিবারও বঙ্কিমবাবুর অনুমতি দিলেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর কৃত "দেবী চৌধুরাণী"র অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন শ্রীমান পুরেন্দুসুন্দরকে দেবীর অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজের অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনুবাদকদিগকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু আমার মত নাবালকের নিকট তাঁহার আপত্তির সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না।" তিনি কি অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাসও উদ্দেশ্যমূলক নয়। সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাঁটি 'স্বদেশী' ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গলাদেশে 'স্বদেশ' দেখাইয়া ও চিনাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্যই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবাও নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক, ইহাই হয় ত তাঁহার কামনা ছিল।

* * * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?"

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্যই উপন্যাস লিখিতেন? বঙ্কিমবাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনেক-

দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার হইয়া আছে,—হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমবাবু অনেকদিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; বেদের দেবতা, ধর্মপ্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা 'হইয়া উঠিবার' পূর্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন?" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আরম্ভ করিতে পারিলে শেষ হইয়া যায়।—যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তা হ'লে, ইংরেজী করে' ছাপান যাবে। কি বল?"

আমার সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুর মনে ছিল। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

*　　　　*　　　　*

১২৯৯ সালে বাঙ্গলা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরম্ভ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সন্নিহিত হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চরমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাঁদরামী দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামালাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী; সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে "জন্মভূমি"তে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলালবাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, "সাহিত্যে"র একজন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য, প্রতিষ্ঠাশালী সুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন; এবং "সাহিত্যে" ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

প্রবন্ধটি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পড়িলাম। আমাদের "সাহিত্য" তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল। এখন গণও নাই তন্ত্রও নাই; জনও তো খুঁজিয়া পাই না।—যাক, এখন গণের কথাই বলি। এই রচনায়

লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে 'বানর' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই।"

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন ; কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাই তখন "সাহিত্যে"র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার লেখা না ছাপ সুবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রবন্ধটির শেষ বিদ্রূপ খুব Smart হয় নাই। কিন্তু একজন—হায়! তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "রচনা বেশ হইয়াছে। তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না।" নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল। অমন স্নেহময় প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না। অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। সাহিত্যই তাহার জীবনের সম্বল ছিল। কাব্য ও কবিতা ও কলাসৌন্দর্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত। সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবিলতা, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। নলিনীকে আমরা 'কবি' বলিয়া উপহাস করিতাম। নলিনী টুর্গেনেফ টলষ্টয়, হায়েনে প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। চৈতন্য লাইব্রেরীতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানী করে, তখন অনেকের পক্ষে সে সকল প্রহেলিকা ছিল। শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত,—সংসারের কুটিল চক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

"দারিদ্রের মৃদু গর্বে চরিত্র সুন্দর!" নলিনীর পক্ষে অন্বর্থ বলিয়া মনে হইত। নলিনীর জীবন বলিত—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন তপোবন স্থলে!"

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধহয় মনে মনে বলিতেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপাসা ভাজা, মোপাসা চচ্চড়ি, মোপাসা ছেঁচ্‌কী, মোপাসার ছ্যাঁচ্‌ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে! কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোপাসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।"

দুইদিন পরে অপরাহ্ণে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠকখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বসো।" তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্তী বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র জুঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতেছেন! মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।" বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে একখানি সোফায় বসিলেন,—আমাকে বলিলেন, "মেয়েটি আমার সই!"

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার বড়নাতি হারমোনিয়াম বাজাইতেছে। আমি নাতিদেব সঙ্গে খেলাধূলা করি। হারমোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই নাই। তুমি বাজাইতে পার?"

আমি বলিলাম "না।"

"গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?"

"আমি খুব ভালবাসি।"

"তবে শেখ না কেন?"

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই। কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা, যত্ন, কিছুরই ত্রুটি হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবিষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্ত্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর 'দাদা' আর আমার দাদামশায়ের কথা একসঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে।

তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ যে সর্বস্ব—জীবন দিতে পারি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।"

"আপনার কি মত?"

"তুমি সম্পাদক—তোমার মত কি আগে জানি।"

"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি? আপনার মত কি বলুন?"

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আগে তোমার মত কি বল।"

আমি বলিলাম, "আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।"

"কেন? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ? আষাঢ় মাসের 'সাহিত্যে'ত 'সমুদ্র-যাত্রা'র পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ?"

"প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কি না, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি।"

"তবে এটা ছাপিবে না কেন?"

"যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে। এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোনও লাভ নাই।"

"গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ?—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয়; জান?"

আমি বলিলাম, "এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে?—ইহার ব্যঙ্গ—"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "আমার খুব smart মনে হয় নাই।"

"সবই কি খুব smart হয়?"

আমি বলিলাম, "প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি — — —

কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি?"

"পুরাতন কাসুন্দী?"

"আপনার সেই ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্বিত চর্বণ।

ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবেও রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্য, গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি, সেই কুকার্য নিজেরা করিতে পারি।—তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—"

"না; আমি তোমার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না।—বাবু যদি চটেন? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন এবং বেশ লেখেন।"

"আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব।—তাতেও যদি চটেন, আমি কি করিব।"

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুশী হইলেন। পকেট হইতে সেই রস রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না। আর ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব Original—Smart,—to the point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালিই বটে।'

আমি বাড়ীতে আসিয়া প্রবন্ধটি ফেরত দিলাম। মহিলা সম্পাদিত একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি ঠিক বঙ্কিমবাবুর মত ছিল এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশা করি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দনদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে শোক ভুলিয়া আমার শ্রাদ্ধ করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি। আমি কিন্তু কলমটি রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব বিফল করিলেন কেন? অথবা "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়" :—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে।

বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন। তাঁহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরানের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত,

কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত; কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া মোছা; মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিরাইয়া, ধীরে ধীরে তামাক টানিবার আয়াসে ভোগ করিতেন। বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্দর্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য, শব্দ চয়নে সৌন্দর্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীও সৌখীন, সৌন্দর্যপ্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির 'রচনারীতি' খুব সৌখীন।

সেকালে "সাহিত্যে"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব সরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকা। ইহা 'রাজসংস্করণ'। রাজসংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা সংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। একজন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী;—টাঙ্গাইলের জমীদার কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। ইনি এখন 'রাজা'র ভাই দাদা বটে।

যাক্। অবশিষ্ট নিরানব্বইখানি আমরা বাছিয়া বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই রাজ সংস্করণের "সাহিত্য" লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিম-বাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। "সাহিত্য" খানি হাতে করিয়া লইলেন; বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার।" উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?"

আমি বলিলাম, "এক শত এই রকম ছাপা হয়, সব নয়।"

"তাতেও ত অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?"

"কেহ নয়। আমরা সখ করিয়া ছাপি। এক জন গ্রাহক হইয়াছেন!" প্রমথবাবু নাম বলিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বইগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দামও বাড়াইতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশের লোকে বেশী দাম দিয়া কিনিতে পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রী কমিয়া যাইবে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তা হ'তে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব।"

আমি বলিলাম "দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।"

"তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয় এদেশে এখনও cheap literature এর সময় হয় নাই। আমার মনে হয়, উপন্যাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।"

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিলাম, "সকলের সুবিধার জন্য আমরা 'সাহিত্যে'র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—'সাহিত্যে'র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। 'বঙ্গদর্শনে'র সময়েও দেখেছি, 'প্রচারে'ও দেখিয়াছি;—যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।"

"যাহারা খুব গরীব তাহারা কি পড়িতে পাইবে না।"

"খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায় এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প! আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literature এর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিষ সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়াশুনা থাকিলে যে সব জিনিষ পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literature এর সম্বন্ধ আছে।"

তারপর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "দিব্যি get up হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমরা ত আর কিছু করিতে পারিব না। কাগজে, মলাটে, বাহারে যা হয়—"

"কেন ? তোমাদের কাগজ ত বেশ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি 'বঙ্গদর্শন' ঘুড়ির কাগজে বটতলার ছাপাখানায় ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব ?"

মনে করিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন ; বলিবেন, "তা বটে।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন "তোমরা না পারিবে কেন ? এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, 'বঙ্গদর্শনে'র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গলায় অনেক জিনিষ লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎসামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যে'র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত **original research** করিয়া বঙ্গদর্শনে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের 'মৃত্যুর পরে'—উঁচুদরের লেখা। 'বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।—তোমরা পারিবে না কেন ? 'বঙ্গদর্শনে'র কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে ; তোমাদের কাজ তোমরা কর।"

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের "মৃত্যুর পরে"র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর **style** এরও তিনি প্রশংসা করিতেন। "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের বৈদিক প্রবন্ধাবলীও "বেদ প্রবেশিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় দুই-ই ইঁদুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, "আপনার লেখা ? আপনার প্রবন্ধ, সমালোচনা, উপন্যাস,—সে রকম আর কে লিখিবে ? সে গৌরব ত আর কোনও মাসিকের ভাগ্যে ঘটিবে না। আপনি ত আর কোনও কাগজে লিখিবেন না।"

"আর লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই ; আপনার সেই প্রথম দিনের হুকুম মনে আছে।"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বাললেন, "তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ এত টাকা খরচ করিতেছ; 'বন্ধ করিয়া দাও' বলিতেও ইচ্ছা করে না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচপত্রটা চলিয়া যায় এমন কিছু করা যায় না?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যায়। সে উপায় আপনার কাছে। আমার বলিবার উপায় নাই।"

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম "একটাই দিন না।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তোমাকে একটা দিলে ত চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতীদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার 'ভারতী' আছে। রবি আসেন; জান ত, 'প্রচারে'র সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'সাধনা' আছে। তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে। তারপর আর এক আছেন,—আমার বেয়াই দামোদর বাবু।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার 'প্রবাহ' ত নাই। তিনি কি আবার—"

"না; তিনি নব্য ভারতের জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছি—আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। এখন তিনটী লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা ত বলিতে পারি না।"

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল;—হারানবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন, জান?—বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু হারানবাবুকে আর একদিন পাঠাইয়াছিলেন। 'জন্মভূমি'র জন্য আমার উপন্যাস চান, পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন।"

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু স্বনামধন্য, এখন রায়সাহেব হইয়াছেন। কোনও চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালাইয়া দেখাইতে হয় না। হারাণচন্দ্রের জন্য মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায়সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বসুন হারাণবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না।"

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহাও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, না। তারপর হারাণবাবুকে বলিলেন "সাহিত্যের get-up দেখুন।"

হারানবাবু বলিলেন, "কথানিই বা ছাপা হয়? 'জন্মভূমি' অনেক ছাপিতে হয়; 'জন্মভূমি'র ছাপাও মন্দ নয়।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

হাসিতে হাসিতে হারানবাবু বলিলেন, "যোগেনবাবুকে কি বলিবেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বলিবেন—আমি পারিব না।" তার পর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই এক টান তামাক টানিয়া বলিলেন, "ভক্তি প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি?"

হারাণবাবু বলিলেন, "আমি আর একদিন আসিব।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কিন্তু আমাদ্বারা হইয়া উঠিবে না।"

আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম তাঁহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই। আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনানয়নে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"

বঙ্কিমবাবুর কথা

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

আমি যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি তখন একদিন শুনিলাম যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা নীচের ক্লাসগুলিতে ভর্তি হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অলংকার বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার ভগিনীপতি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্বের কথা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম; বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী পড়িয়াছিলাম। তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রাদিকে দেখিতে গেলাম। যেখানে জিমন্যাষ্টিক হইত তথায় তিনজনকে দেখিলাম; বেশভূষার খুব পারিপাট্য। আমার এক বন্ধু বলিল, "ওরা বড়লোক; সকলের সহিত কথা কহে না।" আমি অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিচয় দিলাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বড়টি শ্রীশ (বঙ্কিমবাবুর জ্যেষ্ঠ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র দ্বিতীয়টি জ্যোতিষ (৺মেজ ভাই ৺সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র)। আমার পিসতুতো ভাইয়ের সহিত শ্রীশের অল্পদিনেই খুব ভাব হইল। আমিও তাহার সহিত কয়েকবার কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিলাম, এবং একবার বঙ্কিমবাবুকে দূর হইতে দেখিয়া ছিলাম। বঙ্কিমবাবুর পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালেশ্বরে এবং মেদিনীপুরে কার্য করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদব বাবু চারিজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতা—এবং রায়বাহাদুর দোল দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত করিতেন। তাঁহার বাটিতে সবই বড়মানুষী কায়দা ও ব্যবস্থা দেখিলাম।

যখন বঙ্কিমবাবু হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন কলিকাতার একটা থিয়েটর (গ্রেট ন্যাশন্যাল) চুঁচুঁড়ার খালি বারিকে আসিয়া অভিনয় করিল তখন শুনিয়াছিলাম যে অভিনেত্রী গোলাপীর অভিনয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্কিমবাবু তাহাকে একছড়া চেনহার পুরস্কার দিয়াছিলেন। বড়মানুষী কায়দার সহিত ইহার মিল খাইতে পারে তাহা তখন জানতাম না বলিয়া ব্যাপারটা ভাল লাগে নাই। আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়িতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর পবিত্র (পিউরিটানিক) ধরণ অনেকটা রক্ষিত থাকায় আমার মনে আইসে নাই যে রাজা রাজড়া ও বড়মানুষদের নিকট কীর্তনীয়া শাল বকশিস পায়; পরে শুনিলাম যে

বড়লাট লিটন সার্কাসের মিস ভিকটোরিয়া কুককে "এ্যম্প্রেস অফ দি এরীনা" উপাধিযুক্ত একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। এ কার্য দিল্লীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া পদবী গ্রহণের পরেই ঘটে; এ বিষয়ে ইউরোপীয় শিষ্টাচার কি কি বলে তাহা অবশ্য আমি আজিও অবগত নহি।

বঙ্কিমবাবুকে পূজ্যপাদ পিতৃদেব বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনিও হুগলীতে থাকিতে প্রায় প্রত্যহই আসিয়া পিতৃদেবের নিকট বসিতেন। হুগলী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ৺গোপালচন্দ্র গুপ্ত এবং নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরা উঁহাদের সহিত মিলিয়া সংস্কৃত কাব্য নাটক এবং গুবাদির সৌন্দর্য এবং গভীরতার আলোচনা করিতেন। "আজ বঙ্কিম আইসে নাই, আজ আমাদের তেমন সুখ হইলনা—" দুই একদিন এইরূপ কথা পিতৃদেবকে বলিতে শুনিয়াছি।

আমার যখন নোয়াখালিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে নিয়োগের সংবাদ আসিল (অক্টোবর ১৮৮০) তখন একদিন বঙ্কিমবাবু আমাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত হুগলী কাছারীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মোকদ্দমা কিরূপে হয়, সাক্ষী কোথায় দাঁড়াইয়া বলে, জেরা কিরূপ ব্যাপার, কিরূপে জবানবন্দী লিখিতে হয়, সমস্ত কাছে বসাইয়া দেখাইলেন। তাহার পর অফিসে লইয়া গিয়া কিরূপ চিঠিপত্রের উপর কিরূপ হুকুম দেওয়া হয় এবং তদনুসারে আফিস হইতে কিরূপে মুসাবিদা হইয়া আইসে, তাহা কিরূপে সংশোধন হয় এবং নকল হইয়া বাহির হইয়া যায়, কতটা সময়ের মধ্যে এ সমস্ত সাধারণতঃ হইয়া যাওয়া উচিত—তাহা বুঝাইলেন। রোডসেস অফিসে গিয়া কালেক্টারির নথি সম্বন্ধে কি করিতে হয় তাহারও কিছু দেখাইলেন। ফিরিবার সময় গাড়িতে বলিলেন, "তোমার পিতা বলিয়াছেন, 'বাড়ি হইতে এক মাইল মাত্র দূরে কাছারী; কিন্তু ও কখনও এত বয়সেও কাছারীর সময় তথায় যায় নাই; একেবারে অপরিচিত স্থানে গিয়া অজ্ঞাত কার্য করিতে ভিতরে বেশী ভয় পাইয়াছে বোধ হইতেছে; তুমি কাছারীর কাজ একটু দেখাইয়া সাহস দিও। এখন সাহস পাইতেছ কি? গিয়া কতকগুলি পুরাতন নথি পড়িও। পুরাতন চিঠিপত্র অফিসে পড়িও। ধরণটা সহজেই বুঝিতে পারিবে।"

সর্বদিগ্‌দর্শী কৃপাময় পিতৃদেব যে কিরূপে হৃদয়ের সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া সর্ববিষয়ে সহায়তা করিতেন, তাহা এ ক্ষেত্রেও দেখিলাম এবং বঙ্কিমবাবুর সমস্ত

াদনের যত্নে বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম। পিতৃদেব বলিলেন, "এই চাকরীর সর্বপ্রধান অলঙ্কারের কাছে তোমার নূতন কার্য সম্বন্ধে হাতে খড়ি দেওয়াইলাম।"

যখন নোয়াখালীতে (১৮৮২) চাকরীর পর হাবড়ায় বদলী হইয়া আসিলাম, তখনি বঙ্কিমবাবু হাবড়ায়। মিঃ সি. ই. বকল্যাণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। শুনিলাম উভয়ে বনিতেছে না। তখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চে একজন করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট ?) থাকিতেন। বকল্যাণ্ড সাহেব হুকুম দিলেন যে, কোন মোকদ্দমায় এক টাকার কম জরিমানা করা হইবে না। ঐ সাধারণ হুকুম পাইয়া, বঙ্কিমবাবু চটিয়া গিয়া ফুটপাতে বোঝা নামানো, বেলাইনে ঘোড়ার-গাড়ি রাখা, অজ্ঞ লোকের রাস্তার ধারে প্রস্রাব, প্রভৃতি মোকদ্দমায়, চার আনা বা আট আনার পরিবর্তে সেদিন নাকি দুই আনাও জরিমানা করিয়াছিলেন ; এবং একটা মিউনিসিপ্যালিটির মোকদ্দমায় নোটিসে কদর্য আদালতী বাঙ্গালায় লিখিত "জলনীয়" শব্দের অশুদ্ধি ধরিয়া আসামী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বকল্যাণ্ড সাহেব রাগের মাথায় নথির গায়ে লিখিলেন, 'ইনসফারেবল পেডান্ট্রি' (অসহনীয় বিদ্যাকলান)।* বঙ্কিমবাবু তাঁহার রায়ের গায়ে আমলাদের দেখাইয়া ওরূপ মন্তব্য লেখার প্রতিবাদ করিলেন ; এবং হয় উহা কাটিয়া দেওয়া হউক, না হয় কমিশনার সাহেবের হুকুম জন্য কাগজ পত্র পাঠান হউক এরূপ জিদ করিলেন। কমিশনার বিম্‌স্ সাহেব বঙ্কিমবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শেষে টিপ্পনিটির প্রত্যাহারই হয়।

অল্পদিন মধ্যেই আমার উপর মিউনিসিপ্যাল বেঞ্চে বসার হুকুম হইল। বঙ্কিমবাবুর সহিত আর সর্বদা খিটিমিটির কারণ না থাকায় তাঁহার সহিত বকল্যাণ্ড সাহেবের চটাচটি একটু কমিয়া আসিল। বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল

*'বঙ্কিম জীবনী' নামক সুলিখিত পুস্তকে আছে যে কোনও বুড়ির গোলপাতার চাল সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির নোটিসে 'কম্বষ্টিবল' শব্দের অনুবাদে 'জলীয়' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল, বঙ্কিমবাবু নোটিসের ভাষায় এই অশুদ্ধি জন্য বুড়িকে খালাস দিয়াছিলেন ; তাহাতে বকল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন "বঙ্কিমচন্দ্রাস ভ্যানিটি ইন দি নলেজ অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ হাজ মিজলেড হিস জাজমেণ্ট।' আমি স্বচক্ষে সে নোটিস বা বকল্যাণ্ড সাহেবের সে টিপ্পনী দেখি নাই ; কিন্তু অল্পদিন পরেই হাবড়ায় আসিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই উপরে লিখিলাম। ঘটনার সহিত উভয় বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই।

আণ্ডার দি লেফটেনেন্ট গভর্ণস” পুস্তকে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসাই করিয়াছিলেন। নোয়াখালিতে থাকিতেই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপদেশ পাইয়াছিলাম যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহাতে চটিতে নাই; মনে করিতে হয় যে তখন সাহেব তাঁহার পুলিসের কর্তার (হেড অফ দি পুলিশ) বা সরকারী উকিলের (পাবলিক প্রসিকিউটরের) উপরওয়ালার 'মূর্তিতে' আবির্ভূত; তাহার কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া তাহার পর ঠিক যাহা উচিত তাহাই করিতে হয়; কিছুতেই একটু বেশিও নয় একটু কমও নয়। সুতরাং আমি বকল্যাণ্ড সাহেবের সার্কুলার সত্ত্বেও চারি আনা আট আনা যথাযোগ্য জরিমানাই করিলাম। সাহেবের “স্লিপ” আসিল—“আমার অমুক তারিখের সার্কুলার দেখ। এক টাকার কম জরিমানা অসঙ্গত।”

সেই কাগজেই আমি বিচারকের স্বাধীনতা এবং লোকের অবস্থার বিভিন্নতা সম্বন্ধে দুই লাইন কস্ কস্ করিয়া লিখিয়া ফেলিতেই মনে হইল যে উচ্চতর কর্মচারীর সম্বন্ধে যে বিনীত ধরণ সর্বদা রক্ষার প্রয়োজন, শব্দ নির্বাচনে সেরূপ ঘটিতেছে না। “ঝাঁজ” প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং ন্যায় পক্ষে থাকিয়াও অন্যায্য ধরণ জন্য অনর্থক হারিয়া যাইব। তখন আর কিছু না লিখিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট গিয়া কাগজটা দেখাইলাম।

তিনি বলিলেন, ‘বাঙ্গালী যখন বলে ‘রাগের মাথায় করিয়া ফেলিয়াছিলাম,’ তাহার অর্থ এই যে তখন মাথা বা মস্তিষ্ক প্রকৃতাবস্থায় ছিল না, বুদ্ধি বিচলিত ছিল এবং সে জন্য তখনকার কার্যে এখন সে লজ্জিত। বঙ্কিম একজন প্রকৃত বড় লোক; তিনি রাগের মাথায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন—জিদে দুই আনা জরিমানা করিয়াছিলেন, অথচ ঝগড়ার পূর্বে চারি আনার কম করেন নাই। তুমিও ভুল করিতে যাইতে ছিলে। রাগের মাথায় অফিসের কাগজে কিছু লিখিতে নাই; অপর কাগজে কিছু লিখিয়া, এক রাত্রি নিদ্রা গিয়া তাহার পর সেই লেখাটার (নিজেই একটু বিরূপ বিদেশী উপরওয়ালা সাজিয়া) ভাষার এবং ধরনের খুঁৎ অনুসন্ধান করিতে হয় এবং নিখুঁতভাবে সংশোধন করিতে হয়; তাহার পর চিত্রগুপ্তে'র চক্ষে উহার বিষয়টা ন্যায়ের পথে ঠিক আছে কি না পুনর্বার দেখিয়া লইতে হয়, যেন ভাষার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া আসলে ত্রুটি না হয়, সত্যপথ ঠিক থাকে। কাজটা নিখুঁত এবং ধরণ বিনীত—ইহাই ত ভদ্রলোকের পক্ষে সঙ্গত। এক্ষেত্রে কিছুই লেখার প্রয়োজন ছিল না; তবে সার্কুলারের কথা যখন

জানিতে তখন প্রথম দিনেই রায়টা সাবহিত এবং বিস্তারিত ভাবে লেখা একান্তই উচিত ছিল। তাহা হইলে হয়ত স্লিপ আসিত না। 'দোষ স্বীকার করাতে চার আনা জরিমানা,' এরূপ অলস ভাবের রায় ঐ সার্কুলারের পর আর চলে না। লিখিতে হইবে—রাস্তার ধারে প্রস্রাব করা স্বীকার করিতেছে; কলের কুলি; রোজ আট আনা রোজগার করে; আজ কাছারী আসিতে হওয়ায় এবং কল্য আটক হওয়ায় যে ক্ষতি ও কষ্ট পাইল তাহাতে আর এরূপ করার ইচ্ছা উহার পক্ষে সম্ভব নয়; চারি আনা জরিমানাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।' বিভিন্ন মোকদ্দমায় এরূপভাবে বিস্তারিত লিখিতে গিয়া যেখানে দেখিবে জরিমানা একটাকা বা অধিকই ন্যায্য—যেমন ভদ্রলোকেরা মাতলামি প্রভৃতি—তথায় অবশ্য তাহাও করিবে।"

সাহেবের স্লিপে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া তুলিয়া, তাহার উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া 'দেখিলাম' (সীন) এই কথাই লিখিলাম।

পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব বেশ বুঝিতে পারিবেন যে চটিয়া কি সব লিখিয়াছিলে; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। সংযমের ভিতরে তেজকে শ্রদ্ধা করিতে হয়; এক পক্ষের অসংযমেই প্রতিপক্ষের সুবিধা।"

লোকে আজকাল বলে গুরুর কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত মোটা কথাও ত মনে হয় না! পিতৃদেবের কথায় নিখুঁত ভাবে কর্তব্য বুঝিলাম এবং পরবর্তী বেঞ্চে সেইরূপেই কার্য করিলাম। বকল্যাণ্ড সাহেব চার আনা আট আনা জরিমানা হইয়াছে রেজেষ্টারী হইতে দেখিয়া, চটিয়া নথি তলব করিলেন পেস্কারের নিকট শুনিলাম যে আমার সকল রায়গুলি পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তিনি হাসিয়া ফেলিলেন—এবং শেষে বলিয়াছিলেন "হি ইজ ক্লেভার" (বুদ্ধিমান বটে) আর কখনও সার্কুলারের কথা হাবড়ায় কাহারও সম্বন্ধে উঠে নাই। সাহেব পূর্ব হইতেই আমার উপর একটু অনুকূল ছিলেন।

হাবড়ায় কল কারখানা ডক রেলওয়েতে সহস্র সহস্র লোক কাজ করে। দুর্ঘটনা হাত পা কাটিয়া যাওয়া লাগিয়াই থাকে। বঙ্কিমবাবুর উপর 'ডাইয়িং ডিক্লারেশন' (মৃত্যুকালীন উক্তি) লেখার ভার পড়িয়াছিল। রাত্রে শীতকালে হঠাৎ ডাকমত দূরস্থ হাসপাতালে যাওয়ার কষ্ট তাঁহার হইত। তাঁহার চাপরাসীকে আমি বলিয়াছিলাম যে বেশি রাত্রে ওরূপ কাগজ আসিলে তাহা যেন আমার কাছে লইয়া আইসে, আমি কাজ করিয়া দিব। বার তিনেক ঐরূপ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার অধিক বয়সে কিন্তু তোমার জন্য এরূপ কেহ করিবে এ আশা করিও না। আমি বলিয়াছিলাম, "ক্রমেই দেশের লোক খারাপ হইবে এই কথা বলিতেছেন ? আমরা ভোগে পাপের ক্ষয় করিয়া ঝাড়িয়া উঠিতে পারিব, এ আশাটাও করিব না।"

বঙ্কিমবাবুর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, "ব্যক্তিগত আশাভঙ্গের ও ক্ষোভের কথা বলিতেছিলাম। দেশের জন্য আশা করিবে বই কি।"

বকল্যাণ্ড সাহেব তিনমাসের জন্য গয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেলেন। এ সময়ের মধ্যেই বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনেকটা নিকট পর্যন্ত গাড়ি যাইতে পারে এরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; তাঁহার অনুরোধে গয়ালীরা বিনামূল্যে জমি দিয়াছিল। আর্মষ্ট্রং সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন। সেই সময় আমার নিকট একটি আবগারীর মোকদ্দমা হয়। কলিকাতা এবং হাবড়ার আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইগলটন সাহেব বাদী। তিনি বলিলেন যে, আধুলিতে ছুরি দ্বারাই চিহ্ন করিয়া গোয়েন্দাকে দিয়াছিলেন, গোয়েন্দা আসামীর নিকট হইতে সেই আধুলি দিয়া গাঁজা কিনিয়া আনিয়া দেয় ; তিনি অল্প দূরেই ছিলেন। অবিলম্বে গিয়া থানাতলাসী করিলেন, তাঁহার দাগ দেওয়া আধুলি দোকানির জলখাবারের দোকানে পাওয়া গেল। তাঁহাকে আসামীর পক্ষে হইতে ভাল উকীলে খুবই জেরা করিতে লাগিলেন। শিয়ালদহে, কলিকাতায় এবং হাবড়ায় কত আবগারী মোকদ্দমায় তাঁহার এবং ঐ গোয়েন্দার আসামী ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার তালিকা উকীলের হস্তে প্রস্তুত ছিল ; সেই সকল প্রশ্ন হইল। সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনতিদূরবর্তী দোকানে গিয়া সাহেবের বর্ণনার সহিত ঘটনার স্থান মিলাইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত পড়িল। গাড়ি করিয়া সকলে তথায় গিয়া একজনকে দিয়া নক্সা প্রস্তুত করাইয়া লইলাম এবং তাহাকে হলফ দিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম সে নক্সা ঠিক। ইগলটন সাহেবকে বলা হইল যে নক্সা দেখিয়া কোথাও কিছু বেঠিক থাকিলে ঐ সরেজমিনের সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন। সাহেব নক্সাটা স্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন এবং বলিলেন যে জেরা করিবেন না বস্তুতঃ সাহেব কাছারীতে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন স্থানটি তাহা হইতে একান্তই বিভিন্নরূপ দেখা গেল। থানাতল্লাসীর সময় সাহেব এবং গোয়েন্দা নিরপেক্ষ সাক্ষীর নিকট নিজেদের অঙ্গতালাসি না দিয়াই দোকানে ঢুকিয়াছিলেন, ইহাও প্রমাণিত হইল। আমি আসামী খালাস দিলাম। অপ্রতিভ

হইয়া সাহেব আমার উপরেও চটিয়া গেলেন। তিনি অন্যান্য মোকদ্দমার ফল সম্বন্ধে জেরা থামাইয়া দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন—আমি তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই। ইগলটন সাহেব কলিকাতার কলেক্টরের নিকট দরখাস্তে লিখিলেন যে তিনি হাবড়ায় আমার এজলাসে বড়ই অপমানিত হইয়াছেন; হাবড়ায় আর মোকদ্দমা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আদালতের নিকট রক্ষার সাহায্য (প্রোটেকশন অফ দি কোর্ট) প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা আর কোথাও কখনও হয় নাই, ইত্যাদি। কলিকাতার কালেক্টার ঐ দরখাস্ত নিজের বক্তব্য সহ প্রেসিডেন্সি কমিশনারকে পাঠাইলেন; বর্ধমানের কমিশনার উহা হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেকে পাঠাইয়া আমার কৈফিয়ৎ লইতে বলিলেন। আফিসে কাগজটি পাইয়াই আমি বঙ্কিমবাবুকে খুঁজিলাম। শুনিলাম বঙ্কিমবাবু তখন প্রবীণ ডেপুটি এবং পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের এজলাসে বসিয়া আছেন। তথায় গিয়া দেখিলাম কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই; লোকজনও বিশেষ নাই। উঁহাদের উভয়কে ঐ কাগজপত্র পড়িতে দিলাম।

ঈশ্বরবাবু বলিলেন, "লিখিয়া দাও ওরূপ আর হইবে না; আমার এই দুই বৎসরের চাকুরী, বহুজ্ঞতা হয় নাই।" পরামর্শটা বেশ মনে লাগিল না। নিজের আফিসে কার্য করিতে গেলাম। একটু পরেই বঙ্কিমবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপরে তাঁহার ঘরে গেলে বলিলেন, "ঈশ্বরবাবুর পরামর্শ ঠিক নয়; ওরূপ করিতে নাই। তুমি সুবিচারের জন্য পরিশ্রম করিয়াছ, দোষ কিছু কর নাই, শুধু শুধু দোষ স্বীকার কিসের?"

আমি বলিলাম, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "জাতীয় প্রকৃতি অনুসারেই সকল ব্যবস্থা। আমরা মনে ভাবি আসামী দোষ স্বীকার করিতেছে, অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহা একটু কম সাজা দেওয়া যাউক কিন্তু ইংরাজের মন কঠিনতর। ইংরাজ বলিবে 'নিজেই স্বীকার করিতেছে (হি ইজ কন্‌ভিকটেড অফ হিজ ওন মাউথ) এবং আনন্দে ফাঁসির হুকুম দিবে, অপরাধ স্বীকার জন্য দ্বীপান্তরের হুকুম দিবে না। উহাদের ব্যবস্থাও উপযুক্ত ধরনের। ইংরাজ অপরাধী বলিবে, আমি নির্দোষ (নট গিলটি); তুমি প্রমাণ করিতে পার ত কর; আমি তোমায় সেজন্য সাহায্য করিতে যাইতেছি না—তোমার চক্ষু অভিশপ্ত হউক! (প্রুভ ইফ ইউ ক্যান, আই অ্যাম নট গোইং টু হেল্প ইউ ড্যাম ইয়োর আইজ!)

আমি বাড়ি গিয়া পিতৃদেবকে সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ভুল ভাবিয়াছে; বঙ্কিমের কথাই ঠিক। একটা মুসাবিদা করিয়া ফেল এবং বঙ্কিমকে দেখাইয়া লও।'

আমার মুসাবিদা বঙ্কিমবাবুর কাটকুটে দাঁড়াইল :—"ইংরাজের আইনের পরম গৌরবই এই যে, প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করিতে হয় এবং জেরা প্রভৃতি সর্ববিধ উপায়ে নির্দোষিতা প্রমাণের সম্পূর্ণ সুবিধা তাহাকে দিতে হয়। ইহা কল্পনারও অতীত যে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক এরূপ পাতলা চামড়ার হইবেন যে আসামীকে এরূপ সঙ্গত সুবিধা (ফেয়ার অপরটুনিটি) দেওয়া হইতেছে দেখিয়া প্রকৃতই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতে পারেন। বস্তুতঃ 'প্রতিপক্ষ সাক্ষীর কথাই বিশ্বাস করুন, তিনি বড়লোক; মিথ্যা বলিতে পারেন না,' এরূপ সকল কথা আসামীর পক্ষ হইতে বলানর জন্য কোন বিচারককে চেষ্টা করিতে হইবে এরূপ আবদার সুস্পষ্টতই অসঙ্গত। এই সঙ্গে নথি দাখিল করিতেছি; জেরা অসঙ্গত হইয়াছিল অথবা সাহেবকে অবমাননা করিবার জন্য প্রশ্ন হইয়াছিল কিনা উহাতেই প্রকাশিত হইবে।"

এরূপ কৈফিয়ৎ দাখিল করিলে ম্যাজিস্ট্রেট আর্মষ্ট্রং সাহেব লিখেন, "এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ হওয়ায় উহাকে সর্বপ্রকার মোকদ্দমাই বিচার করিতে অসঙ্কোচে দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর আবগারী মোকদ্দমা উহাকে দিব না। কৈফিয়ৎ সর্বতোভাবে সন্তোষজনক নয়।"

বঙ্কিমবাবুকে ঐ সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "মনিবটি আমাদের সুপণ্ডিত বটে! উহঁার সিদ্ধান্তে মোটকথা এই যে পরীক্ষায় নম্বর বেশি রাখিয়া তুমি উহাকে না 'ঠকাইলে' উনি তো মোকদ্দমাটি তোমাকে দিতেনই না, সুতরাং এ সকল জ্বালা ঘটিত না!"

বীম্‌স্ সাহেব কমিশনর কাগজপত্র পাইয়া লিখিলেন......"এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে চিনি; (আমার বাড়ি চুঁচুড়ায়; আধ পোয়া পথ দূরে কমিশনরের কুঠি; নোয়াখালি হইতে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত তিনবার দেখা করিয়াছিলাম) তিনি খুব সুযোগ্য ব্যক্তি; উঁহার পিতা গবর্ণমেন্টের সুবিশ্বস্ত উচ্চ কর্মচারী। ইগলটনকে আমি কখনও দেখি নাই; শুনিয়াছি আদালতে উহার ব্যবহার সুসঙ্গত নহে।"

আমার স্বপক্ষে হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, এ বিচার প্রণালীও অপূর্ব! যখন একদিকে 'জানাশোনা' এবং অপর দিকে 'কখনও দেখি নাই" * তখন আর কথা কি? বঙ্কিমবাবুকে সংবাদ দিলাম। কলেক্টর এবং কমিশনার উভয়েরই হুকুম সম্বন্ধে বলিলেন, "কত অল্প বুদ্ধিমত্তার সহিত পৃথিবীর শাসন চলিতেছে! (উইথ হাউ লিটল উইজডাম ইজ দি ওয়ার্লড গভার্ণড)।"

এই ঘটনা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সুন্দর উক্তিগুলি আমি অনেককে বলিয়াছি এবং তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে নিজ মুখে স্বীকারের (কনভিকটেড আউট অফ হিজ ওন মাউথ) কথাটি অপরকে বলার সময় প্রায়ই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবু নিজে কিন্তু মৃণালিনীতে নায়কের উপর ইংরাজী মেজাজ আরোপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"পাপীয়সি নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি।" বঙ্কিমবাবুর সহিত কথার সময়েই ইহা আমার মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু সে সময় পাছে ঠিক গুছাইয়া তাঁহাকে সঙ্গত ভাবে বলিতে না পারি এই ভয়ে উল্লেখ করি নাই। যদি করিতাম তবে তাহা শুনিয়া তিনি যে খুবই হাসিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে নায়কের এক তীরে হস্তী মারিয়া ফেলার কথা বঙ্কিমবাবু পরে বাদ দিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছেন "প্রথমে মনে ছিল হেমচন্দ্র খুব লড়াই করিবে; কিন্তু সে সব ত কিছুই হইল না! তাই ওটা উঠাইয়া দিলাম।"

* আমি পেন্সন লইয়া ৺কাশীধামে আসিলে একদিন (১৯১৫) আনন্দবাগে শ্রীমৎ মৈথিল স্বামীজির সমক্ষে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্যাপটিষ্ট মিশনরি জনসন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি পরিচয় করিয়া দিলে পাদরী সাহেব বলিলেন—'এইবার যীশুখৃষ্টকে ভজ।' (বোধহয় ইঁহারা শপথ করিয়া আসেন যে খৃষ্টের নাম সকলকেই অন্ততঃ একবার শুনাইবেন; নচেৎ আমার ন্যায় কাশীবাস করিতে আসা বৃদ্ধ হিন্দুকে ভজাইতে পারার সম্ভাবনার কোন লক্ষণই তিনি দেখিতে পান নাই) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাতে সুবিধা?"

পাদ্রি সাহেব বলিলেন, "শেষ বিচারের দিন যীশু তোমার সুবিধা করিয়া দিবেন।"

আমি বললাম, "আমিত একটা অস্তি-হীন মনুষ্য, কিন্তু যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম তখন বিচারে কখনও চেনা-অচেনার পার্থক্য করি নাই। আর যীশু ঐ কার্য করিবেন? আমরা হিন্দু, আমরা জানি—অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। ভগবৎ শরণের ফলও পাইব দুষ্কৃতির ফলও ভুগিব, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল ভুগিতে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কার্য করা কতটুকু ঘটে?"

যখন ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হাবড়ায় আসিলেন, তখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বেঙ্গলী সংবাদপত্রে জষ্টিস নরিসকে জর্জ জেফ্রিস-এর সহিত তুলনার জন্য দুই মাস কয়েদ হইয়াছেন। জষ্টিস নরিস আদালতে শালগ্রাম শিলা তলব করাতে ঐ মোকদ্দমাকে আমরা 'নারায়ণের মোকদ্দমা' বলিতাম। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জন্য নানাস্থানে সভাসমিতি এবং বক্তৃতা হইতেছিল। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাবড়াতেও সভা ও বক্তৃতা হইবে। কে কি বলে শুনিয়া নোট করিয়া লইয়া আমাকে সংবাদ দিও।"

আমি 'হাঁ না' কিছুই না বলিয়া চাকরীকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া বঙ্কিমবাবুর নিকট গিয়া সমস্ত বলিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অত বিষন্ন হইবার মত কিছু হয় নাই। তোমাকে স্পাইং (গোয়েন্দাগিরি) করিতে হইবে না। প্রকাশ্যভাবে সংবাদ সংকলন এবং প্রদান (ওপ্‌ন ইনকোয়ারি এণ্ড রিপোর্টিং) হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। চাপরাস বাঁধা আর্দালি সঙ্গে লইয়া গিয়া উপস্থিত সকলকেই শুনাইয়া বলিবে 'আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সভার নোট লিখিয়া রিপোর্ট লিখিতে নিযুক্ত। আমার একটু বসিবার এবং শুনিয়া লিখিবার সুবিধা আপনারা করিয়া দিলে উপকৃত হইব।' তাহার পর যাহা লিখিবে ও রিপোর্ট করিবে তাহা একজিকিউটিভ অফিসারের কার্য হইবে। তাহাতে কোন দোষ নাই। আর এক কাজ কর, দুইজন কনষ্টেবল চাও। ডেপুটির পশ্চাতে লাল পাগড়ী সকলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।"

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বঙ্কিমবাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমার শোকসংবিগ্ন মানসে শান্তি আনিয়া দিয়াছিলেন। চীফ ইনস্পেক্টর সামুয়েলকে কনষ্টেবলের জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম যে সভাসমিতির রিপোর্ট লিখিবার সময় উহারা আমার সহিত থাকিবে।

সামুয়েল তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের চিরকুট (স্লিপ) আসিল যে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাকে সভা সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে না।

হাবড়ার সাব ট্রেজারির কার্যের ভার আমার উপর ছিল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের জল খাওয়ার বা বসিবার জন্য পৃথক কোন ঘর ছিল না। বেলার দু'টার সময় ট্রেজারির তালা খুলিয়া তাহাতেই আমরা জলযোগ করিতাম। বঙ্কিমবাবুর আমার এবং গৌরদাস বসাক (পিতৃদেবের সহপাঠী) মহাশয়ের বাটি হইতে জলখাবার

আসিত। একদিন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "খাবার একত্র করিয়া তিন ভাগে পরিবেশন কর।" তাহাই করা হইল। বাড়ির প্রস্তুত জলখাবার, ভীমনাগের সন্দেশ এবং ফজলি আম প্রভৃতি প্রত্যেকেই খাইলাম। দুইটা আলবোলায় উহাঁদের ভাল তামাক আসিল। কথায় কথায় দেশের শোষণ, ইংরাজের দম্ভ প্রভৃতি উল্লেখ হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমরা কি প্রকৃতপক্ষেই এই মুহূর্তে অন্তরের অন্তস্তলে কোন দুঃখ বোধ করিতেছি? তিনজনে গড়ে মাসিক ছয়শত টাকা বেতন পাই; এইমাত্র যেরূপ জলযোগ করিলাম, তাহা করিতে পাইলে কি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়? ধর এখনই কোন ইংরাজ আসিয়া যদি 'এখানে কি হইতেছে' বলিয়া আমাদের হঠাৎ লাথি মারিতে আরম্ভ করে এবং বাসার ভিতর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায় তবেই না সেখানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে মারিতে পারি—ক্রোধ কার্যে প্রকট হয়।"

সাঁত্রাগাছীতে 'রামরাজা'র মেলা হয়। একরাত্রে গোপাল বাবু, নাজীর এবং রামদাস মৈত্রেয় উকীল ভাড়াটে গাড়িতে তথায় যাইতেছিলেন; হঠাৎ একজন কনষ্টেবল গাড়ির পিছনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফৌজদারী আদালতের নাজীর এবং উকীল গাড়িতে থাকায় গাড়োয়ানের সাহস হইয়াছিল; সে কনষ্টেবলকে নামিতে বলিল, কিন্তু গালি শুনাই তাহার সার হইল। গোলযোগ শুনিয়া নাজীরবাবু গাড়ি থামাইতে এবং কনষ্টেবলকে নামিতে বলিলেন। কিন্তু কনষ্টেবল এরূপ উদ্ধত ভাবে নামিতে অস্বীকার করিল যে, নাজীর বাবু ছড়ির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। তখন কনষ্টেবল নামিয়া আসিয়া দুইবাবুকেই ডাণ্ডার দ্বারা প্রহার করিতে করিতে 'জুড়িদার'কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া পড়িল। তাহারা লোক চিনিয়া বলিল, "করিয়াছিস কী? কাছারীর নাজির ও উকীলবাবুকে মারিয়া কপালে দাগ করিয়াছিস?" তখন সেই কনষ্টেবল তাড়াতাড়ি গাড়ির আলো দুইটি নিবাইয়া দিল এবং রাস্তা হইতে একটা খোয়া তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় আঘাত করিয়া বলিল, "বিনা আলোয় গাড়ি যাইতেছিল, আটক করায় বাবুরা আমায় মারিয়াছেন!"

পরদিন কনষ্টেবলের মোকদ্দমা দায়ের হইল। একদফা বাবুর উপর সরকারী কার্যে বাধা দেওয়া আর একদফা গাড়োয়ানর বিনা আলোতে গাড়ি হাঁকানো। তখন কাজেই বাবুদেরও মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইল। বঙ্কিমবাবুর কাছে বিচারে সে মোকদ্দমায় কনষ্টেবলের তিনমাস কয়েদ হয়। জজ সাহেবের কাছে আপীলে

সাজা খুব কম হইয়াছিল ; তিনি কনষ্টেবলের ও গাড়োয়ানের ঝগড়ার মধ্যে নাজীর-বাবুর হস্তক্ষেপ করিয়াছড়ি চালানোর দোষেই তাঁহার মার খাইতে হওয়ার উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কাছে এরূপ কতই মোকদ্দমা হইয়াছে। এইটির উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে মোকদ্দমা যাহাতে উঁহার কাছে না হয় এজন্য নাকি পুলিশের বিশেষ চেষ্টা ছিল ; এবং মোকদ্দমাটি ঐ সময়ে লোকমুখে 'রামরাজার মামলা' এই অদ্ভুত নাম পাইয়াছিল।

হাবড়া ছাড়ার পর আর বঙ্কিমবাবুর সহিত অধিক দেখা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার মনোমধ্যে মুদ্রিত আছে। এ জীবনে আমি যে তাঁহার মত ভাল এবং বড়লোকের দর্শন লাভ করিয়াছি, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল-কৌতুক-প্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর-সকলে জনতার অংশ কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র ভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উপদেশ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমল হাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারত সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্যঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়ন দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

পরিশিষ্ট

সঞ্জীবচন্দ্র শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য দেশকালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটেনা। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেননা অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালী সাহিত্য সভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা ত জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহ সুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

---

* ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই ওই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষগুণ দুই-ই থাকে; আমার অগ্রজের ও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে তাঁহার দোষগুণের কথা কিছুই বলিবনা। এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন না কিছু কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটাল পাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটাল পাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। * তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র; পরমারাধ্য ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ১৭৫৬ সালে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, যে, তাঁহার জন্মকালে, তিনটি

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিতব শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজন্তে যেন গত স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই "দাদা মহাশয়" কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু, তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশনাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কিনা।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালায় গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেতপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরু মহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে, কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীব চন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছু কালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেননা আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিনচারি বৎসর কাটান। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। সেইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত **Junior Scholarship** পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটাল পাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। **Junior Scholarship** পরীক্ষার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরুমহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জন করিতে পারে না।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায়ঃ সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। একদিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিদ্যা শিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব জ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্তা—

Lord of himself, that heritage of woe! কাজেই কতকগুলো বিদ্যানুশীলন বিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতি পরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলাবাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কলেজে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড মাষ্টার গ্রেবস্ সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করা যাউক, কলেজ যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কলেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কলেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা

সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল ; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না লেখাপড়া ভাল করিয়া থাকি ; এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্তি কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরল চিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই ; বর্ধমান দূরদেশ। এই সংবাদ যথা কালে তাঁহার কাছে পৌছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কলেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জিবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্বাগ্রজ ৺শ্যামাচণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল :—সঞ্জীবচন্দ্র Junior scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন যে, সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই যে, পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফল যত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভা বলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কলেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে, এখন ইহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।—তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্ধমান কমিশনারের আপিসে একটি সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে অপিসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ছিলেন। ইনিও হইবেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এপথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিবেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া "ল" ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, কাঁঠালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতাঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যায় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন তখন। উইল্‌সন সাহেব নূতন ইন্‌কামটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় এসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটি এসেসরিতে নিযুক্ত করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তারপর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন যে, পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্টিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিব মন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জ্বলিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না যে, এ জিনিষটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপ্‌মান্‌ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে, Hills VS. Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফেটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব, সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, “ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারিনা; সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবেনা।”

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরের আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত

উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নিরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ এবং বহু সৎসুহৃদ্ সংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ণ আনন্দ প্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্টিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালাসাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে *সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথনাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আগুক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তারপর অল্পদিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম গেল। তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল।

---

*সঞ্জীবনীসুধা

বড় সাহেবদিগকে এ কথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্‌সস্‌ হইল। এ কার্যের কর্তৃত্ব **Inspector General of Registration** এর উপরে অর্পিত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল ঠিক্ ঠিক দিবার জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন; কিছু দিন পরে হুগলীর সব রেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টর অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বর্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতেই সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা

প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন। আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভালবাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণ কান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ," "দেবী" তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জাল প্রতাপচাঁদ," "পালামৌ," "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্যাধ্যক্ষতার কার্যের বিশৃঙ্খলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না; একমাস, দুইমাস, চারিমাস, ছয়মাস একবৎসর বাকি পড়িতে লাগিল। বর্দ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রির বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা একজন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই মাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রর। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন।

বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে, সঞ্জীবচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃ-দেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্মচারী এমন ছিল যে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যতদিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা ও চক্ষুলজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা-কড়ি "মুগুরি বাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বর বিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ের রচনা সংকলনের ভূমিকা।

বঙ্গ দর্শনের বিদায় গ্রহণ   শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আযদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সংবাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন একথা বলায় আত্মশ্লাঘার কিছুই নাই। কেন না এমত ব্যক্তি বা এমত বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিবে। ব্রত-বিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্য-জীবন ক্ষণস্থায়ী এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়, এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহ সংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি

মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠক শ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তি বিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কিনা সন্দেহ। এবৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই। তথাপি পাঠক শ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপি শক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আবার একটি স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সংবাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু-ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর ও ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল, আমি কেবল অবজর্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারত-সংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও তেজস্বিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ্ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ্ জলে মিশাইল— ১২৮২, চৈত্র

বঙ্গদর্শন

(কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত)

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে…যান্, আগে যারে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিকপালগণ পূর্ব্বমত দিকপালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি—

তাং—৪ বৈশাখ। ১২৮৯ সাল। [১৬ এপ্রিল ১৮৮২]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। * * * সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ, আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ, আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, "বন্দেউদরং"।

বৈশাখের "বান্ধব" পাইয়াছি। এবং "মূলমন্ত্র" "জাতীয় সঙ্গীত" এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও "শাপেনাস্তংগমিত মহিমা" শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণী সৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল "যমদ্বারে মহাঘোরে প্রাপ্তা বৈতরণী নদী" সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত জানিত উড়িষ্যার বৈতরণী পারেই যমদ্বার বটে।

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ তখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এজন্য স্থির করিয়াছি, যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।

আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন।

ইতি— —২৩ পৌষ [১২৮৯] [৬ জানুয়ারি ১৮৮৩] অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

শ্রীচরণেষু—

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্রপাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু একটুকু লাইনে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি—

তাং—২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

প্রিয়তমেষু,

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব।

কৃষ্ণসম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা William the Silent)। ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এচেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচরিত মনুষ্যচরিত। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য চরিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে?

ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন [১২৯২] [১০ অক্টোবর ১৮৮৫]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[গিরিজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত]

সাদর সম্ভাষণম্—

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারেনা। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারীচরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ।

তবে আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।

আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূব উদ্ধৃত কবা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমি চন্দ্রবাবুর মতেব অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে

কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়বাবু আপনার সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

ইতি ১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩] [২৪শে মে ১৮৮৬]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ

[জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

প্রিয়তমেষু,

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে।

আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি লিখিয়া পাঠাইলাম। ঐ সাতটি Golden rule বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। উহার অনুবর্ত্তী হইলে সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে।

ইতি ১৩ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ উপদেশ।

I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কথন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমেব মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

III. উপরওয়ালারা আজ্ঞাকারী তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

IV. আপনার কাজের Rules Laws বিশেষ রূপে অবগত হইবে।

V. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে, সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

VII. নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

শ্রদ্ধাস্পদেষু, [২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫] ৮।৬।৮৮

তিনকড়ি বাবুর নিকট একসেট্ পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুস্তক ধর্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জিনে নোট করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব।

[ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

৫নং প্রতাপ চাটুয্যার গলি
কলিকাতা—১৩ই জুন [১৮৮৮]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,— [৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫]

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে স্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং অনুরুদ্ধ না হইয়াও পড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তকগুলি যেরূপ বাজারে বিক্রয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি একরকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং আবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না,

এজন্য যেমন ছিল তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।

গীতা পুনশ্চ 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতেছে। যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তবে আমরা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয় দেখিতে আপনার ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত]

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমারবিনয়কৃষ্ণ দেব
আশীর্বাদ ভাজনেষু

আপনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহে। তবে সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমত :—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস্ করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং তখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ। আপনারা সমুদ্র যাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া, সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন;

কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্যাই শূদ্রের ধর্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা কি সেই ধর্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবসা চালান যায় কি? হাইকোটের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া, বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া, ধর্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ, প্রয়োজন মতে ধর্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে, প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেককাল বিসর্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে, অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিলে কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (**Religious and moral regeneration**) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণ চরিত বিষয়ক গ্রন্থে, ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন—শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্রযাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণে প্রচলিত করিতে পারিবেন না।

তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখন আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ যে যান নাই ইহা আমার দৃষ্টি-গোচরে কখনও আসে নাই। তবে, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষে কি আমাদের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্বক বাঙ্গালী

সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথা এবং বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দু সমাজে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজ সম্মত ব্যবহার করিলে, সাধারণতঃ তাঁহারা যে পরিত্যক্ত হইবেন, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম-শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্মশাস্ত্র সম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণভক্তি এইরূপ আছে।

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্দ্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
কর্ণপর্ব্ব একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্মলোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম। এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে। হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষত আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন—হিন্দু ধর্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোন

বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।

আপনার একান্তমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর, ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে"। অন্যে এ কথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্রে (Scotsman) বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode গুলির সহিত তুলনীয় এবং একজন বলিয়াছেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে।

তাং—১৯শে পৌষ ১৩০০ [২ জানুয়ারি ১৮৯৪] ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়